অসাধু সিদ্ধার্থ

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

রাখহরি শ্রীমানী এণ্ড সন্স্
২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীঅভয়হরি শ্রীমানী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
১৫নং নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

ছায়াপথ যার আভরণ—

ধূমকেতু যার কলঙ্ক—

সেই শূন্যকে।

অসাধু সিদ্ধার্থ

সিদ্ধার্থর দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ দেহ ; বর্ণ গৌর ; মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ; এম্নি করিয়া সে মাটিতে পা ফেলিয়া চলে যেন পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিকূলতা আর বিমুখতা সে অতীব অবজ্ঞার সহিত দু-পা দিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছে . মানুষের সঙ্গ দিয়া, সাহচর্য্য দিয়া তার কোনো প্রয়োজন নাই ; সহানুভূতির সে ধার ধারে না—

এই তার বাহ্যিক মূর্ত্তি ।

কিন্তু ভিতরটা তার অন্য রকম···কিছু দিন হইতে সেখানে অগ্নিগিরির অগ্নিবমন সুরু হইয়া গেছে ।—ভিতরে সে শ্রান্ত, অতিশয় পরমুখাপেক্ষী ।

প্রাপ্ত সিদ্ধার্থ নাম, তদুপরি প্রাপ্ত বসু উপাধিটি, এবং উহাদের সংযোগে প্রাপ্ত একটি জীবনধারার অতীত ইতিহাস ও সুবিধাগুলি সে প্রাণপণে খাটাইয়া দেখিয়াছে—

সুফল তেমন ফলে নাই ; ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহাকে কারবার তুলিতে হইয়াছে ।

সহরের এক অনুন্নত অংশে তার বাস ; কোনো প্রকারে দেহটাকে সজীব রাখিবার আয়োজন সেখানে আছে ; আর কোনো সুখের বস্তু নাই ।

সিদ্ধার্থ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে—

ভাবনার আদিও নাই, অন্তও নাই ; কি ভাবিতেছে তারও বিশেষ দিক্ দিশা নাই···তবে ভাবনাটা যেন মাঝে মাঝে

থমকিয়া হা হা করিয়া শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে—যেমন দীপের চঞ্চল শিখাগ্রটা উর্দ্ধের অন্ধকারের অঙ্গে সূক্ষ্মতম রেখায় বিদ্ধ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়…

কিন্তু দাহ তার থাকেই।

সিদ্ধার্থর বড় অর্থাভাব—

ঋণ মিলিতেছে না; মিলিতেছে কেবল ঋণ পরিশোধ করিবার অসহিষ্ণু কঠিন তাগিদ্।

সিদ্ধার্থ ক্ষুধার্ত্ত—

চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে।……

দরজার সম্মুখে হঠাৎ কে হাঁকিয়া উঠিল,—সিদ্ধার্থ জেগে আছ?

সিদ্ধার্থর ক্লান্ত চোখের ভারি পল্লব দ্রুতগতি উঠিয়া গেল; পরিচিত কণ্ঠ; বলিল,—আছি, এস।

যে আসিল সে যে সিদ্ধার্থর বন্ধু তাহাতে কোনো বিসম্বাদই নাই; উপরন্তু সে পথে-পাওয়া লৌকিক বন্ধু নয়, সুখ-দুঃখের দরদী জন।

সিদ্ধার্থ বলিল,—বস'; বড় অন্ধকার, বন্ধু।

দেবরাজ হাসিয়া উঠিল—

ইদানীং সিদ্ধার্থর চালচলন দেখিয়া আর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বেচারীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তাহাদের দারুণ একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে।

তাই দেবরাজ ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—অন্ধকার কোথায়? দিব্যি দিনের মত ফুট্‌ফুটে জ্যোছ্‌না।

—বাইরে নয়, ভাই, ভেতরে। বলিয়া অনিচ্ছুক দেবরাজের ডান হাতখানা বুকের উপর টানিয়া তুলিয়া লইয়া সিদ্ধার্থ বলিল,—অন্ধকার এইখানে। কান পেতে থাকো, একটা শব্দ শুন্‌তে পাবে। ভগবানের অভিসম্পাত বুকের গহ্বর জুড়ে চেপে বসে আছে; তার ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত উঠ্‌ছে পৃথিবীর ক্ষুধার গোঙানি।······বলিয়া দীর্ঘ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সে বন্ধুরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অনুভব করিতে লাগিল কেবল নিজেকে।

দেবরাজ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিতেছিল—

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিকাইতে পারিল না; হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—বড় বেশী অন্ধকারই বটে; কিন্তু এ অন্ধকারের মানে কি? অভাব ত? আমি চাঁদ এনেছি···একেবারে পূর্ণচন্দ্র, ষোলকলা; উঠি-উঠি করছে। দেখ্‌বে? বলিয়া চাঁদ দেখাইবার জন্যই যেন সে হাত টানিয়া লইল।

—দেখ্‌তে ত চাই। কিন্তু তোমার হাত দিয়ে যখন অযাচিতভাবে উঠে আস্‌ছে তখন সন্দেহ হয়, সে চাঁদে কলঙ্ক বিস্তর।

ভারি একটা তামাসার কথা যেন—

দেবরাজ ভারি দেহ দুলাইয়া দুলাইয়া অজস্র হাসিতে লাগিল; বলিল,—হাসালে', সিদ্ধার্থ, এত্‌দিন পরে। চাঁদের কলঙ্ক দেখে ডরাচ্ছ, তুমি! সে কলঙ্ক কি কলঙ্ক!···সে গল্পের

বুড়ি, আর জ্যোতির্ব্বিদের পাহাড়। যাক্ সে কথা—কাজের কথা মন দিয়ে শোনো। রাসবেহারী একখানা চিঠি দিয়েছে তোমায় দিতে। কিন্তু চিঠি হস্তান্তর করবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি নেবার কথা আছে। প্রস্তাবে তুমি রাজি হলে, চিঠি দেব না। চিঠি আগে চাও, না প্রস্তাবটাই আগে শুন্‌বে?

—প্রস্তাবটাই আগে শোনাও, তবে সংক্ষেপে।

—সংক্ষেপেই বলছি। রাসবেহারী স্যাক্‌রা এবং মহাজন তা জানো। তার একটা পুরণো শত্রু আছে, পারিবারিক শত্রু। এই শত্রুটার বা'ড় সে একটু দমিয়ে দিতে চায়, মানে একটু থেঁতলে দেওয়া আর কি .....

—কিন্তু আমি ত' মুগুর চালা'তে জানিনে।

—জানো যে তা-ও ত আমি বলিনি। মুগুর ত নির্ব্বোধের অস্ত্র; বুদ্ধিমানের যে অস্ত্র তাই ব্যবহার করতে হবে। তাতে তুমি দক্ষ।...শত্রুটি গরীব কিন্তু জেদী আর দুষ্টু।...সে তার বাপের শ্রাদ্ধের সময় বসত-বাড়ী বাঁধা রেখে চারশো টাকা, আবদ্ধ তমসুক লিখে দিয়েছে—মানে, সেইটে তোমায় লিখ্‌তে হবে। তুমি বিশ্বাসী গুণী লোক। একশোখানি রূপচাঁদ, নিষ্কলঙ্ক, নগদ, হাতে হাতে। অন্ধকার—

দুইজনে পা ঝুলাইয়া তক্তপোষে বসিয়াছিল—

সিদ্ধার্থ তক্তপোষের কিনারাটা আঙুল বাঁকাইয়া চাপিয়া ধরিয়া উপরের দিকে টানিতে লাগিল; বলিল,—দাঁড়াও......

টানিতে টানিতে হাত দু'খানা তার টান্ টান্ হইয়া সমস্ত

দেহটাই খাড়া হইয়া দেখিতে দেখিতে আড়ষ্ট শক্ত হইয়া উঠিল।

দেবরাজ তাহার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল—এবং তাহার মানসিক হাসির আর বিরাম রহিল না।···তার বুদ্ধিতে সে ইহাই বুঝিল যে, এটুকু সিদ্ধার্থের অভিনয়—যেন ভিতরে সুমতি আর কুমতির তুমুল একটা লড়াই বাধিয়াছে।

কিন্তু দেবরাজ ভুল বুঝিল—

পুরাতন বন্ধু, তবু সিদ্ধার্থের খানিকটা তার চোখের আড়ালেই ছিল—

সত্যই একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যতদূর অধঃপতিত এবং হীনতায় মগ্ন বলিয়া সিদ্ধার্থ পরিচিত তাহা একেবারেই ভুল না হইলেও, দুর্ব্বিপাকের পাকের ভিতর পড়িয়াও তার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মনে দেবরাজের অনুমানের অতীত একটা স্থানে কু ও সু-এর কলহ এখনো ঘটে।

···নিরতিশয় ক্লেশকর অপমানবোধের সহিত সিদ্ধার্থের মনে হইতে লাগিল, মানুষের মনে কতদূর গভীর ইতরতায় নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মিলে তবে সে এ-হেন প্রস্তাব লইয়া আর একজনকে টাকার লোভ দেখাইতে আসিতে পারে।···ভিখারীরও কাণ্ডজ্ঞান আছে···অভাবের তাড়নায় দেহ আর রূপ যার পণ্য তারও ধর্ম্ম আছে; তারও ঘৃণার বস্তু পৃথিবীতে আছে; তার নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা আছে; পরলোক, পাপ-পুণ্য সে মানে; শ্রদ্ধার দাবীও

সে করে; কিন্তু কোন্ নরকের অতল গহ্বরে নামিয়া গেলে মানুষ দুনিয়ার আর সবই একধারে ঠেলিয়া দিয়া কেবল অর্থকেই প্রাপ্তির চরম স্বর্গ মনে করে!...

সিদ্ধার্থ এক নিমেষেই যেন একটা ঘুরপাক্ খাইয়া ভাসিয়া উঠিল—

চোখে পড়িল, জীবনের অতীত ইতিহাসের সমস্তটা...তার যত দুষ্কৃতি, যত অপকার্য্য, যত অধর্ম্ম। কিন্তু সিদ্ধার্থর মনে হইল, তারাও যেন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে তাহাকে আনিতে পারে নাই—সমতল ভূমির উপর শিলাস্তূপের মত কঠিনতম আর উচ্চতম হইয়া উঠিল চোখের সম্মুখে এইটাই। ...কাহারো সর্ব্বনাশ সে কখনো করে নাই; নিরাশ্রয় অন্নের কাঙ্গাল করিয়া কাহাকেও সেপথে বসায় নাই।...

সিদ্ধার্থ সহসা চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—ভয় করে। আমি পারব না, ভাই।

হাসিয়া দেবরাজ বলিল,—জেলের?

—না। যদি টাকা হাতের ওপর জ্বলে ওঠে!

—খাসা বলেছ। নতুন রকম কথা কইবার যোগ্যতা তোমার বেশ। চিঠিই তবে শোনো। বলিয়া পড়িতে লাগিল—

প্রিয় বন্ধু সিদ্ধার্থ,

যদিও তুমি ইংরেজি ভাষা ঠিক্ ইংরেজের মতই বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছ, তথাপি এই চিঠিখানি বাংলাতেই লিখিলাম, আমারই সুবিধার খাতিরে—আমি ইংরেজি জানি না। অত্যন্ত

অসাধু সিদ্ধার্থ

দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, তোমার অনুরোধ আমি এ-যাত্রা রক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রথম কারণ, আমি বহুসংখ্যক সন্তানের পিতা, তদ্ধেতু অর্থের অভাব অনুক্ষণ অনুভব করিয়া থাকি। দ্বিতীয় কারণ, হিসাবে দেখিলাম, সুদ বাবদ তোমার নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত একটি পাইও পাই নাই; অথচ হ্যাণ্ডনোট্ দুইবার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

সুস্থিরচিত্তে একটি সৎ পরামর্শ গ্রহণ করিবে কি? তোমার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে আমি সন্দিহান নহি। তোমার বিচারবুদ্ধি, ভূয়োদর্শন, বাক্‌চাতুর্য্য প্রভৃতি সবই আছে এবং ছিল; কিন্তু ক্ষেত্রনির্ব্বাচনে তোমার ভুল হইয়াছিল। ব্যবসা তোমার কাজ নহে, অতএব সে সংকল্প ত্যাগ কর। এই পতনের পর আবার যদি পড়ো, তাহা হইলে আর তোমাকে তোলা যাইবে না।

তোমার দেহে কান্তি আছে, সৌষ্ঠব আছে, সর্ব্বাঙ্গে তোমার লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করিতেছে; তোমার অশেষ গুণ; তোমার বাক্য প্রাণস্পর্শী, তোমার গাম্ভীর্য্য শ্রদ্ধেয়, তোমার মাথা হেলাইবার ভঙ্গী চমৎকার, তোমার বাহ্যজ্ঞান অসাধারণ, এবং সুদ জমিয়াছে ঢের। শেষোক্ত দ্রব্যটিকে পরিশোধ করিয়া অপরাপর সদ্‌গুণগুলি কাজে লাগাও। তুমি বিবাহ কর। আজ-কাল তোমার উপযুক্ত পাত্রী মিলিতেছে। এমন স্ত্রী গ্রহণ করিবে যে তোমাকে তুলিতে পারে। তোমার বয়স এখন ত্রিশ কিম্বা তার কিছু বেশী, সুতরাং পাঁচ সাতটি বৎসর তুমি অকারণে

জলে নিক্ষেপ করিয়াছ। বয়সের অপব্যয়টা স্মরণ করিয়া তৎপর হও।

সুদাদি কিছু পরিশোধ করিবার সুবিধা হইবে কি? তোমাকে তাগিদ্ দিতে বাধ্য হই, ইহাতে আমার প্রাণে যেমন ব্যথা বাজে, তেমন বোধ করি তোমারও বাজে না। কিন্তু কি করিব বল! এই যে আমার জীবিকা, ভাই! মাতৃ-অঙ্গের অলঙ্কার বলিয়া যে অনন্ত জোড়া বাঁধা রাখিয়াছ, তাহা ঠিক্ স্বর্ণের নহে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ জন্মিয়াছে। তখন অতটা দেখি নাই—বন্ধুকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ব্যাপার গুরুতর; আশা করি, এরূপ ব্যবহারের ফলাফল সম্বন্ধে তুমি অন্ধ নহ।

ভাল আছি। সর্ব্বদা তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেছি, এবং যতদিন মনে রাখিবে ততদিন পর্য্যন্ত— তোমার বিশ্বস্ত

শ্রীরাসবিহারী রায়।

—সিদ্ধার্থবাবু আছ কি?

বলিয়া ডাক দিয়া এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই যে-ব্যক্তি ঘরে ঢুকিল তাহাকে সুপুরুষ বলা চলে না; মুখ-চোখের অত্যন্ত নিষ্ঠুর রুক্ষ চেহারা···যেন নরবলি দিয়া আসিল।

তাহার দিকে চাহিয়াই সিদ্ধার্থর ম্লান চক্ষু আরো নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল।

লোকটার নামে আমাদের প্রয়োজন নাই, তার প্রয়োজন দিয়াই প্রয়োজন।

সিদ্ধার্থ "আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেই সে ব্যক্তি শ্যেন-চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—থাক্, আর সমাদরে কাজ নেই। কত দিচ্ছ বল!

মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু অবনত করিয়া সিদ্ধার্থ যখন চোখ তুলিল, তখন লোকটাকে ছাপাইয়া শুদ্ধমাত্র তার খরতাপ কণ্ঠই যেন সিদ্ধার্থর দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজ করিতেছে, এবং সেই কণ্ঠকে উদ্দেশ করিয়াই সিদ্ধার্থ বলিল,—আজ, দাদা, ফিরতে হবে; কাল বিকালতক্……

বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি চক্ষু পুনরায় নত করিল; মিথ্যা যে মিথ্যাই—এ জ্ঞানটা মিথ্যা কহিবার আজন্ম অভ্যাসেও লুপ্ত হয় না; পাওনাদারের ভ্রূভঙ্গী তাই বেশীক্ষণ তার সহ্য হইল না।

—আমি নিজে এলে কখন ফিরি না; আমার দস্তুর, গুরুর আদেশ। বিকালতক্ কি বল্‌ছিলে? চম্পট দেবার মতলব বুঝি? শুন্‌ছি, চারিদিকে তোমার দেনা; তিনবার তুমি কড়ার ভেঙ্গেছ; চতুর্থবারে আমি নিজে এসেছি; সুদ সমেত সব টাকা উশুল না করে আমি উঠ্‌বো না। আমি নিজে কিচ্ছু করবো না; বাইরে আমার লোক দাঁড়িয়ে আছে; তারাই যা কর্‌বার তা করবে। কি বল্‌লাম শুনেছ সব?

—শুনেছি। কিন্তু উপায় নেই; সারাদিন আমি অভুক্ত আছি।

—সুবিধের কথা, লড়তে পারবে কম।

বলিয়া সে-ই যেন লড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল—

সিদ্ধার্থ হাত জুড়িয়া বলিতে লাগিল,—আপনি ধনী, লক্ষ্মী আপনার ঘরে অচলা হ'য়ে আছেন। কত দীন, আতুর, পথের কুকুর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্ছে। আমি আপনার ধনসাগরের মাত্র একটি বিন্দু তুলে নিয়েছি ; হিসাবের অঙ্কে ছাড়া আর কোনো প্রকারেই আপনি সে ক্ষতি অনুভব করতে পার্‌ছেন না। দয়া করে এতদিন যদি স'য়ে আছেন, তবে আর ঘণ্টা কতক সবুর করুন, তারপর আপনি আমাকে—

বলিতে বলিতে কিসে যে তার কণ্ঠ বুজিয়া আসিল তাহা সে নিজে ছাড়া আর কেহ গ্রাহ্য করা দূরে থাক্‌, লক্ষ্যও করিল না।

পাওনাদার তেম্‌নি করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল,—তুমি যে-সব কথা বল্‌লে, গৃহে আমার লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে আছেন, তদ্রূপ অবস্থাতেই বরাবর থাক্‌বেন, আমি মস্ত একটি ধনসাগর··· এমনধারা কথা আমি দায়গ্রস্তের মুখে এত শুনেছি আর এত ঠকেছি যে, সে কথা শুন্‌লে এখন আর প্রাণ গলে না। তুমি অভুক্ত আছ শুনে তোমার কথা আর একবার রাখ্‌লাম ; কিন্তু মনে রেখো, আমায় ফাঁকি দিয়ে কেউ পার পায় নি।

বলিয়া দম্‌ দম্‌ করিয়া পা ফেলিয়া পাওনাদার প্রস্থান করিল—

এবং তারই ক্রুদ্ধ আক্রোশের কথাগুলিকে কে যেন সিদ্ধার্থকে দিয়া মনে মনে বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবৃত্তি করাইতে লাগিল।···

সিদ্ধার্থর আর কিছু না থাক্, একটা চাকর ছিল এবং কাছেই কোথায় দাঁড়াইয়া ছিল—

সে আসিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া দাঁড়াইল—

বলিল,—মাইনে মিটিয়ে দেন, মশাই ; আর কেন ?

সিদ্ধার্থ আশা করিয়া যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল ; অঙ্গুরীটি খুলিয়া ভৃত্যের হাতে দিয়া বলিল,—এস।...

দেবরাজ এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া কেবল মুচকি মুচকি হাসিতেছিল ; এইবার ফুরসৎ পাইয়া বলিল,—অন্ধকার দেখে ভয় খাচ্ছিলে ; কিন্তু তার ওপরেও ঢের কিছু বাকি ছিল দেখ্ছি।

—ছিল ; ওরা দিয়ে গেল কিছু, তুমি দিতে এসেছ কিছু।... আমি রাজি। রাসবেহারীর প্রস্তাব অতি সাধু প্রস্তাব। কাল সকালে যাবো।

—নিশ্চয় ?

—নিশ্চয়।

—তবে এখন আমি উঠি। মূল কথা, অন্ধকার কেটে গেলে যেন চাঁদের ভাগ পাই।—বলিয়া সিদ্ধার্থর পিঠে আদরের দু'টি করাঘাত করিয়া দেবরাজ বিদায় নিল।

তাহারই পদশব্দ কানে লইয়া সিদ্ধার্থ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল...তাহাকে যেন সবাই কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়া বিসর্জ্জন

দিয়া গেল···চিরবিদায় দিয়া যাহারা ফেলিয়া গেল, যাওয়াই তাদের কাজ—

সিদ্ধার্থ খানিক কান পাতিয়া রহিল······

যেন স্পষ্ট কানে আসে, দূরের অন্ধকারে কাহার পায়ের ধ্বনি মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে।

সকলের আগে গিয়াছেন লক্ষ্মী—

তখন দেহটা বিবর্ণ শীতল হইয়া উঠিয়াছিল···বহির্ম্মুখী মন ভিতরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল···তাঁহার অঞ্চলচ্যুত হইয়া যেখানে সে পড়িয়াছিল সেটি দুস্তর নিঃশ্বাসভূমি···

সেইদিন হইতে তার উদরে অন্ন নাই, চোখে নিদ্রা নাই—

কিন্তু দোষ কার!

আশা ফলিত, ছিল সবই, কিন্তু ছিল না কেবল সেইটি—যার সংজ্ঞা নাই, যার স্বরূপ বলিয়া বুঝান' যায় না; যাহাতে উদ্যম সফল হয়, বড় আরো বড় হয়, ছোট উঠিতে থাকে, ছিল না তাই।...সে অদৃষ্ট নয়, দৈব নয়, পুরুষকার নয়···এই সকলের মিলিত সে নিরুপাধিক অজ্ঞাত একটা বস্তু···ছিল না তার তাই।

পালাইয়াছে সবাই—

সঙ্গে আছে কেবল সয়তান—

বহু দিনের প্রিয় ইচ্ছাটিকে আড়াল করিয়া সয়তান আজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—

প্রলোভন দুর্ব্বার···

অসাধু সিদ্ধার্থ

…হাতের কাছেই একখানা আয়না পড়িয়াছিল; হঠাৎ সেইখানা তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের সম্মুখে সে বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিল; নিজের ছায়াটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, এ মুখ ত লক্ষ্মীছাড়ার মুখ নয়, সৌভাগ্যবানেরই মুখ।… কিন্তু এই মুখখানা লুকাইবার স্থান তার নাই।

…আবর্ত্ত রচনা করিয়া কালের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে; স্রোতের বেগ ক্ষিপ্র, প্রখর; কিন্তু ঐ স্রোত আর আবর্ত্তই ত' মানুষের অদ্বিতীয় কর্ম্মক্ষেত্র; স্রোতের বাহিরে পল্বল আর পঙ্ক…

পল্বলের পঙ্কেই আজ সে আবদ্ধ।

ঊর্দ্ধে নিস্তরঙ্গ নীলিমা—

নিম্নে তরঙ্গায়িত শ্যামলিমা—

দু'টিতে চুম্বনে মেশামিশি…

তাহার অন্তরও ত ঐ দুর্নিরীক্ষ্য দিক্‌রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া মিলন-চুম্বনের স্থানটিতে যাইতে চায়…

কিন্তু জীবনের হিল্লোল কেবল অতীতের দিকে উজান বহিতেছে—

উজানদিকের একটি ঠিকানায় তার জীবন বাঁধা পড়িয়া আছে!…সে দৃঢ়বন্ধন সে কাটিবে কি করিয়া!

পাশাপাশি অনেকগুলি ঘর—

একটি ঘরের বাসিন্দা হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল।…কণ্ঠ মধুর নহে, কিন্তু আনন্দ অনাবিল, উচ্ছল।

লোকটি শ্রমজীবী; বাহির হইয়াছিল সকাল সাতটায়, ফিরিয়াছে সন্ধ্যা সাতটায়। এই দিনব্যাপী কঠিন শ্রান্তি এক মুহূর্ত্তেই কি করিয়া ভুলিয়া ঐ লোকটি প্রভাতের পাখীটির মত আনন্দে মাতাল হইয়া গান গাহিতেছে!...

সিদ্ধার্থর বুভুক্ষু আত্মা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এ গান মুখের গান নয়—

কেবল বুকের গানও নয়—

এ গান গৃহের; চারিটি দেওয়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র একটু চতুষ্কোণ স্থানের ভিতর যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি, আরাম আর বিলাস সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহাই যেন লোকটির কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া মহোল্লাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধার্থ গৃহী নয়; গৃহ তার নাই—

বৈরাগী সে নহে; বৈরাগ্য তার জন্মে নাই—

মাঝখানে সে দুলিতেছে...

ইহা যে কত বড় ব্যর্থতা, বিরহ আর শূন্যতা তাহা কেবল সে-ই জানে যার ঘটিয়াছে।

(২)

ঋণ কিছু কিছু পরিশোধ করিয়া সিদ্ধার্থ পূর্ব্বের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছে। পলায়ন ছাড়া তার আর উপায় ছিল না।

অধুনা সে এইখানে, একটা পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের খাদের ধারে।

পাওনাদার পর পর ক্ষুধিত নেকড়ের খড়্গের মত অসহিষ্ণু শাণিত দৃষ্টি লইয়া অবিশ্রান্ত তাড়িয়া আসিতেছে না—

তবু সিদ্ধার্থর মরিতে ইচ্ছা করিতেছে।

সে পলাতক—

সংসারের যে ধর্ম্ম পালন করিলে মানুষের টিকিয়া থাকিবার বনিয়াদ প্রস্তুত হয়, মানুষে মানুষ বলিয়া মানে, সেই ধর্ম্ম সে পালন করিতে না পারিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়াছে।

·· সিদ্ধার্থর মনে হইতে লাগিল, সে যেন গলিত কর্দ্দমকুণ্ডের কৃমি, মানুষের পাদস্পর্শের যোগ্য সে নয়।···কোথায় একটু দুর্ব্বলতার ফাঁক ছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া দুনিয়া তাহাকে ভুলাইয়া ফুসলাইয়া প্রবঞ্চক ইতর সাজাইয়াছে...তারপর তাহাকে গায়ের জোরে ভদ্রসীমার বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছে।—

সিদ্ধার্থ খাদের জলের টগ্‌বগ্‌ আলোড়নের দিকে আয়ত লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—

শেষ-উপার্জ্জনের টাকা ক'টি সত্য সত্যই করতলের উপর জ্বলিয়া ওঠে নাই; কিন্তু তার স্পর্শ যেন একটা দুরারোগ্য ব্রণ-ব্যাধির জ্বালার মত এখনো তার ভিতরে বাহিরে দপ্‌ দপ্‌ করিতেছে।—

...অস্থির জলের নীচে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর বিবেক-দংশনের পরম-শান্তি যেন মিলনাকুলা প্রেয়সীর মত তাহাকে গ্রহণ করিতে বাহু মেলিয়া বুক পাতিয়া বসিয়া আছে।—

প্রপাতের খরস্রোত খাদের গর্ভে লাফাইয়া নামিতেছে—

একটা ক্রুদ্ধ আহ্বান-গর্জ্জনের মত অবিরাম অনন্ত তার শব্দ; উৎক্ষিপ্ত চূর্ণ জলের প্রতিকণায় ইন্দ্রধনুর সবগুলি রং ফুটিয়া উঠিয়াই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে...

মরিতে হয় ত এইখানে—

পিছন্ হইতে কে যেন দু'হাতে তাহাকে গহ্বরের দিকে ঠেলিতে লাগিল...নিষ্পলক চক্ষু তার ঠিক্‌রাইয়া উঠিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিল—

সে জলে আকাশের প্রতিবিম্ব নাই—

কিন্তু যেন আকাশ ছাপাইয়া পরলোকের প্রতিবিম্ব তাহার অন্তরে সজীব হইয়া উঠিয়া আকর্ষণ করিতেছে; কেবলি বলিতেছে আয়! আয়!...

অসাধু সিদ্ধার্থ

হয়তো সিদ্ধার্থ মরিত। কিন্তু অনিশ্চিত সুনিশ্চিত হইবার পূর্ব্বেই ঘটনাচক্র আর এক পাক্ ঘুরিয়া গেল।

জলের ডাকে মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে শুনিতে কি মনে করিয়া হঠাৎ পিছন্ ফিরিয়াই সিদ্ধার্থ যেন থম্‌কিয়া আকাশ বাতাসের মাঝে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল···তার শীতল রক্ত দেখিতে দেখিতে জ্বরাক্রান্তের নাড়ীর মত উদ্দাম হইয়া উঠিল···

অতলে গর্জ্জন করিতেছে মৃত্যু—

কিন্তু সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত ···অসীম আঁধার-সাগরের উপর জ্যোতির্ম্ময় শতদল ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই অঙ্গপ্রভায় দিগন্ত পর্য্যন্ত স্বর্ণপ্রভাতের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—সম্মুখে কত রঙের মেঘ স্তরে স্তরে সাজান, রঙের আর শেষ নাই···স্তরের প্রান্তরেখায় তরল সোনার ঢেউ; পীত মেঘের গর্ভান্তরাল হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম রশ্মির সূত্রগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া আকাশের মধ্যস্থল অম্‌নি একটু স্পর্শ করিয়াই মিলাইয়া গেছে; রুগ্ন সন্তানের মুখের উপর জননীর নিঃশ্বাসের মত বায়ু অতি সতর্ক; পুষ্পস্তর হিল্লোলে হিল্লোলে আকাশের গা বাহিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া দিক্-সীমানায় লীন হইয়া গেছে।···এই ছবিট সিদ্ধার্থের আগে চোখে পড়ে নাই—

যাহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ এই রূপবর্ণাঢ্য প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে

জাগিয়া উঠিয়াছে, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের হিঙ্গুলাভা তার মুখে পড়িয়াছিল—

চক্ষু দু'টি কৌতুকোজ্জ্বল—

সর্ব্বাঙ্গে গতির লীলা-তরঙ্গ—

পা দু'খানির সাড়া পাইয়া মাটি যেন আগাইয়া আসিয়া বুক পাতিয়া দিতেছে। একটুখানি হাসি তার অধরে ছিল—যেন স্বর্গচ্যুত অমৃতের কণাটি, প্রাণের সব মধু যেন অধরপ্রান্তে উথলিয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধার্থের মনে হইল, জীবনের অন্তহীন ধারা একটি মাত্র স্তবকে সীমাবদ্ধ হইয়া একটি রেখার সম্মুখে গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে।—ঐ রেখাটি উত্তীর্ণ হইতে সিদ্ধার্থের মন কিছুতেই চাহিল না।

সিদ্ধার্থের মরা হইল না।

(৩)

যাহাকে দর্শনমাত্রেই সিদ্ধার্থ ডিগ্‌বাজি খাইয়া মরণের তট হইতে জীবনের জ্যোতির্ম্মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বলা বাহুল্য সে একটি নারী। প্রপাতের অদূরে সে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহাকে দেখিয়াই সিদ্ধার্থের মরিবার সঙ্কল্প উল্টাইয়া সরাসরি একটা সহজবুদ্ধির উদয় হইল।—

সঙ্গে পুরুষ আছে—

উহারা কে তাহা জানিবার দরকার আছে বলিয়াই সিদ্ধার্থের মনে হইল।

সিদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া গেল; এবং একটা বৃহৎ শিলাপিণ্ডের আড়ালে থাকিয়া অল্প একটু মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দু'জনায় ঘাসের উপর বসিয়াছে।

সিদ্ধার্থ চেনে না, কিন্তু উহারা দুই ভাইবোন্; নাম রজত ও অজয়া—স্বাস্থ্যানুসন্ধানে এই নিরালা পার্ব্বত্য প্রবাসে আসিয়াছে।

সিদ্ধার্থ শুনিতে লাগিল—

অজয়া বলিতেছে,—কি সুন্দর। সামনে দেখো একটি ছোট্ট ফুল, ছোট্ট মুখখানি বের করে' আকাশের দিকে তাকিয়ে

যেন হাস্‌ছে। ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাইরে এসেছে—মানুষের সঙ্গে চোখোচোখি হ'লেই যেন টুপ করে' ভেতরে পালিয়ে যাবে।

রজত বলিল,—তুলে আনি ফুলটা?

বলিয়াই উঠিবার উপক্রম করিল।

অজয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—না, না; তুমি কি! ফুলটা ত একফোঁটা চোখের জল নয় যে দেখতে হবে তাতে লবণের ভাগ কতটা!

প্রকাশ যে, রজত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়া চোখের জলে লবণের অংশ শতকরা কত এবং সেই লবণসঞ্চয় সে কোথা হইতে করে তাহাই আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় আছে। ......চোখের জলের মত সুলভ অথচ যুগপৎ সুকোমল ও সুকঠিন জিনিষ বস্তুজগতে আর কিছু নাই বলিলেও চলে—

এবং এক সঙ্গেই ব্যাখ্যাত ও অব্যাখ্যাত বলিয়া ওটা বড় আশ্চর্য্য জিনিষ—

মানুষের মনের গভীরতম বার্ত্তাটি নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে প্রকাশ করে ঐ স্বচ্ছ একবিন্দু জল—

কিন্তু কোথায় তার সৃষ্টি-কৌশলের সূক্ষ্ম যন্ত্রটি এবং কোথায় তার ভাবনিবিড়তা—এই প্রশ্নটিকে বাদ দিয়া রজত তার উপাদান লইয়া নিপুণ চর্চ্চা সুরু করিয়া দিয়াছে।—

লবণের কথাটি উল্লেখের সময় অজয়ার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির উদয় হইয়াছিল, কিন্তু রজত যেন তাহা দেখিয়াও দেখিল না;

বলিল,—বাস্তবিক, ফুল দেখ্‌বে ত এসো পাহাড়ে। ভুঁইচাঁপা আর স্থল-পদ্মই ফুটেছে কত। কিন্তু আমি তারিফ্ করছি ঝুলানো ঐ রাস্তাটার। উঃ, কত লোক যে ওটা তৈরীর সময় পড়েছে আর মরেছে তার ইয়ত্তাই নাই। আমাদের সুরেন—

—ও গুলো কি ফুল, দাদা, প্রকাণ্ড একটা গাছে থোপা থোপা ফুটেছে; থেকে থেকে এক একটা খসে' পড়ছে?

—ইয়ে ফুল; নামটা কি ভুলে যাচ্ছি।

অজয়া হাসিল; বলিল,—জানো না তাই বল।

—ঝুলানো রাস্তাটার ওপর একটা মানুষ আমাদের দিকে সুমুখ করে' দাঁড়িয়ে আছে যেন আকাশের গায়ে ঠেস্ দিয়ে······ আরো দূর থেকে দেখলে মনে হবে, আকাশের গায়ে আঁকা। মানুষের স্বচক্ষে দেখাটাও অনেক সময় মিথ্যে হ'য়ে যায় এই দূরত্বের বিভ্রমের দরুণ।

অজয়া কিছু বলিল না।

সেই রাস্তাটার দিকে চাহিয়াই রজত বলিতে লাগিল,—এ পাহাড়ের মাথা থেকে ও পাহাড়ের মাথা পর্য্যন্ত শূন্যের ওপর দিয়ে প্রায় মাইলটাক্ লম্বা ঐ রাস্তাটা গড়তে যেমন বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে, টাকা ঢাল্‌তে হয়েছেও তেমনি। এই রাস্তাতৈরীর কাজে আমাদের সুরেনেরও না কি হাত আছে।

অজয়া ভ্রূভঙ্গী করিল—

এবং রজত বক্রনয়নে অজয়ার মুখের উপর একটা কৌতুক-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল,—সুরেনটা চিরকাল

অকালপক্ক আর কাজ-পাগল। বড়লোকের ছেলে—অথচ দিনরাত কি পরিশ্রমটাই করে···মৌলিকতায় বড় বড় ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারকে হার মানিয়ে দিয়েছে।......বসে খেলে যার নিন্দে নেই, লোকসানও নেই, সে যদি খাটে তা হ'লে বুঝতে হবে দারিদ্র্যকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করে' নেয়। কি বল?

কথিত কারণে দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়া হয় কি না সে বিষয়ে অজয়ার কোনো লিপ্ততাই দেখা গেল না।··· একখানা পাথর দেখাইয়া বলিল,—এটা কি পাথর, দাদা? হিরে পাথর নয় ত?

—এক রকম স্ফটিক পাথর, আভ্-মেশানো বলে' চক্‌চিক্ করছে। কিন্তু আমি বলছিলাম, ঐ রকম স্বেচ্ছাদারিদ্র্যকে আমি খুব প্রশংসা করি। তুমি—

অজয়া হাসিয়া বলিল,—তুমি প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসা করছ। তোমারও ত না খাটলে চলে; তুমি খাট কেন?

এমন কথা অজয়ার মুখে! বলিল,—আমার কথা বলছ! খুব কম সুরেনের তুলনায়······সে কাজ কাজ করে' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছুটে বেড়াচ্ছে, আমি টেবিলের ধারে বসে সৌখীন একটু রসায়ন শাস্ত্র আলোচনা করি। সুরেনের সঙ্গে আমার তুলনা! বাপরে!—

বলিয়া, অজয়ার অযৌক্তিকতায় অবাক্ হইবার জন্য চোখ এবং হাঁ যতটা বড় করা যুক্তিযুক্ত ততখানিই বড় করিয়া রজত অজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অজয়ার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, চোখের জলে

লবণের ভাগ যতই থাক্, দাদার এই অবাক্ হইবার মধ্যে কাতরতাই পনর আনা।

দাদার চোখেমুখে এই কাতরতা দেখা অজয়ার অভ্যাস হইয়া গেছে।

সুরেন রজতের বন্ধু।

রজতের ইচ্ছা, বন্ধুকে সে আরো আপনার করিয়া লাভ করে; তাহার উপায় অজয়া—

দু'টিতে যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যায় তবে......

রজত ভাবে, সে সুখ অনির্ব্বচনীয়।

কিন্তু অজয়া তাহাতে বারম্বার আপত্তি করিয়াছে, অথচ নির্দ্দিষ্ট কোনো কারণ সে দেখায় নাই। তাই রজত যখন তখন ভগিনীর মন বুঝিতে বসে।—

এখনো রজতের হাঁ-টা আর চোখ দু'টি প্রার্থনায় পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল—

কিন্তু সে প্রার্থনার আবেদন বড় দুর্ব্বল...আপাততঃ কোনো কাজে আসিল না।

অজয়া খানিক ভাবিয়া বলিল,—সুরেন বাবুর নামটি আমায় বারবার কেন শোনাচ্ছ, দাদা?

প্রশ্নের সুর শুনিয়াই রজত উস্‌পিস্ করিতে লাগিল; বলিল,—বিশেষ কোনো হেতু তার নেই, তবে তার কথা সর্ব্বদাই আমার

মনে পড়ে—সময় সময় না বলে' পারিনে। তার হাতের এই রাস্তাটা দেখে' আরো বেশী করে' মনে পড়ে' গেছে……দু'দিন আগে তার চিঠিও পেয়েছি ; আমরা কেমন আছি, মহা ব্যস্তভাবে তাই জান্‌তে চেয়েছে……

—ঠিকানা দিয়ে বুঝি চিঠি লিখে এসেছিলে ?

—তাকে এখানে আস্‌তে নিমন্ত্রণ করেই এসেছি। খেটে' খেটে' তারও শরীর ভাল নেই। তুমি মুখে কিছু বলনা বটে, কিন্তু তুমি যে আমার শরীর দেখে' সুস্থ বোধ করছ তা' আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারি। তার শরীর ভাল দেখ্‌লেও কি তোমার আনন্দ হবে না ?

প্রশ্নটি ভবিষ্যতে মানসিক অনিশ্চিত একটু পরিবর্ত্তন সম্পর্কে—

কিন্তু তাহাতেই এমন একটা কঠিন দ্বিধার সুর বাজিল—যেন রজত নিশ্চয় জানে, তার এই অন্তরগত অকপটতা যেমন খাঁটি তেম্‌নি নিষ্ফল—

এবং তাহার দুঃখ এইখানেই।

কিন্তু দাদার এই দুঃখটুকুই কেবল অজয়াকে বিচলিত করিতে পারে না…… ঐ স্থানটিতে কঠোর হইতে তাহার বাধে না।

মাটির দিকে চোখ করিয়া বলিল,—কবে তুমি শোধ্‌রাবে, দাদা ?

—প্রয়োজন হয় শীগ্‌গিরই ; কিন্তু আমার কি সংশোধন তুমি চাও, অজয়া ?

—নিজের চোখ দিয়ে আমার সুখ খুঁজে' বেড়ান……ঐটের সংশোধন চাই।

—তা' হ'লে তাকে আস্‌তে বারণ করে' দি ?

—আমার সুখ খোঁজাখুঁজির কথায় তাঁকে আস্‌তে বারণ করার কথা কি করে' আসে তা' জানিনে। কিন্তু তার দরকার নেই। তিনি আসুন ; তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তুমি থাক্‌বে ভাল। তবে তোমার মনে কোনো অভিসন্ধি আছে যদি বুঝ্‌তে পারি তবে তাঁর সাম্‌নেই আমি বেরুবো না ; তখন বারণ করতে পারবে না যে অভদ্রতা হ'চ্ছে ; চক্ষুলজ্জার দোহাই দিয়ে তখন আমায় নিয়ে টানাটানি ক'র্‌তে আমি দেব না তা' এখনই বলে' রাখ্‌ছি কিন্তু।

রজত অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া উঠিল।—

সুরেনকে মাঝে রাখিয়া ভ্রাতা-ভগিনীর বাক্‌যুদ্ধ এই নূতন নহে ; তবু চিন্তাটা বড় মধুর বলিয়াই কোনোদিন তার নূতনত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আলোচনাটি রজতের কাছে ক্লান্তিকর নীরস হইয়া ওঠে নাই।

বলিল,—সুরেনের প্রতি তোমার মন কেন এমন বিমুখ, সত্যি বল্‌ছি তোমায়, সেটা আমার বড় হেঁয়ালির মত ঠেকে। সে ত' সবদিক্‌ দিয়েই তোমার যোগ্য ! তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে, এমন কি—

রজত জানে না যে, এ-ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচারের দায়িত্ব

তাহার নহে, এমন কি তাহাতে তাহার অধিকার আছে কি না সন্দেহ।

অজয়া তাহা জানে—

তাই সে হাসিয়া বলিল,—তুমি সুরেনবাবুকে খুব ভালবাস', না?

যেন আশার আলোক দেখা গেল—

রজত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল,—তোমাকে যার হাতে দিতে চাই, তাকে কেমন ভালবাসি সেটা অনুমান করা ত' শক্ত নয়!

—তবে আদেশ কর না কেন?

রজত মনে মনে আরো খানিকটা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—যদি করি তবে আদেশের মান রাখ্‌বে?

—রাখ্‌তে পারি, উত্তটত্বের খাতিরে।—বলিয়া অজয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু রজতের মুখের দিকে চাহিয়াই তার হাসি যেন আহত হইয়া নিবিয়া গেল; বলিল,—রাগ ক'রো না, দাদা ক্ষমা করো। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারলে আমি করতুম। বলিয়া হাত বাড়াইয়া রজতের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

এইখানেই এ আলোচনার সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল; কিন্তু রজত ঘটিতে দিল না; বলিল,—তোমার আপত্তি কি বলো, দেখি আমি খণ্ডন করতে পারি কি না।

—তুমি কি জজের সামনে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের দলিল নাকচ্ আর আপত্তিখণ্ডন করছো, দাদা! এ ব্যাপারটা যে তার

চাইতে ঢের বেশী জটিল !······বড় দুঃখ হ'চ্ছে, তোমায় অসুখী করলুম।

—অসুখ একটু বোধ করছি বই কি।

—তবে এই অপ্রীতিকর কথাটা এখন থাক্?

—অপার দুর্ভাগ্য যে পৃথিবীর এত লোকের ভেতর অপ্রীতিকর সেই লোকটির কথাই আমার মনে পড়েছিল।

—অপ্রীতিকর সেই লোকটি নয়, আমাকে নুইয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেঁধে দেবার গোপন ঐ চেষ্টাটিই অপ্রীতিকর।

অতিশয় ক্ষুন্ন হইয়া রজত অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণী করিল,—টাকার লোভে যা তা একটা ভবঘুরে জুটে' তোমার খেয়ালের সাম্‌নে প'ড়ে গেলেই ব্যাপার জটিল থেকে সঙ্কটজনক হ'য়ে দাঁড়াবে। তোমার মতামতের একটা মূল্য আছে তা স্বীকার কর্‌তে আমরা নিশ্চয়ই বাধ্য; কিন্তু এটাও যেন দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি আমায় তুমি দুঃখ দেবে।

—যেটুকু দুঃখ তোমায় বাধ্য হ'য়ে দিচ্ছি তার চেয়ে বেশী দুঃখ তোমায় আমি দেব না। বেলা নেই, চল এইবার ফিরি। বলিয়া অজয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রজত ও অজয়া উঠিয়া গেল—

. এবং সিদ্ধার্থ অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া লাফাইয়া সেখানে পড়িল।···উভয়ের কথোপকথনের সবটাই সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিলিয়াছে; কিন্তু ভিতরে যাইয়া সব চেয়ে পরিপাক পাইয়াছে

রজতের ভবিষ্যদ্বাণীটি।...কি ক্ষণে কথা উচ্চারিত হইয়াছে কে জানে......গ্রহের কল্যাণে কথা ফলিয়া যাইতেও পারে।—রজত বলিয়া গেল, "ভবঘুরে জুটেই তোমার খেয়ালের সাম্‌নে পড়ে' গেলেই"—

ঐ সাম্‌নেই তাহাকে পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয় পর্য্যায় এই—যথার্থরূপে রূপদর্শন সিদ্ধার্থর ভাগ্যে এই প্রথম। জীবনে সে সংগ্রাম করিয়াছে বটে, কিন্তু, বিচিত্র জীবনের দশদিকেই যে মানুষের রথচক্র ধাবিত হইতেছে তাহ তাহার যেমন অজ্ঞাত, তেম্‌নি অজ্ঞাত ছিল নারী—

নারীর রূপ যে ছায়া নয়, তাহা রস-আবেদনে পরিপূর্ণ একটি সজীব গভীর সত্য বস্তু সে জ্ঞান তার জন্মে নাই। অজয়াকে দেখিয়া তাহার পরমাত্মা যেন সহসালব্ধ সেই জ্ঞানের অমৃতলোকে আজ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল—

তাহার মনে হইল, একটি প্রাণের অবরুদ্ধ স্পন্দন নিঃশ্বাসে মুক্তিলাভ করিয়া মুক্তির আনন্দে এই বাতাসেই উল্লসিত হইয়া আছে—

পা দু'খানি দীর্ঘকাল এইখানে রক্ত-কমলের মত ফুটিয়া ছিল—

সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শ মাটির দেহে বাতাসের গায়ে জড়াইয়া আছে......হাসিটি যেন বোঁটার উপর ফুলের দেহ ধারণ করিয়া এখনো হাসিতেছে।

......হঠাৎ ছুটিয়া যাইয়া সে সেই ছোট ফুলটি তুলিয়া আনিল—

টানে পুট্ করিয়া বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেল—

ফুলের মুখ দিয়া আর্ত্তনাদ বাহির হইল না, একটি নিঃশ্বাসও বোধ হয় পড়িল না……

কিন্তু এম্নি ব্যাপারে যে-ব্যথা অশ্রুর জন্মকোষে ঘা দিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করে তাহা সিদ্ধার্থের ভাবানুগতিকতার কোনো স্তরেই নাই—

রজতেরও নাই।

কিন্তু অজয়ার আছে।……তাই রজত তাহাকে ছিঁড়িতে পায় নাই; কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহাকে ছিঁড়িয়া চোখের সাম্নে ধরিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল,—কেন হাস্‌ছিলি তুই ছোট্ট ফুলটি? তার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে, না তার পায়ের তলায় স্থান পেয়ে? তুই জানিস্‌নে, তোর ফুলজন্ম সার্থক করে' দিয়ে কি মমতার চোখে সে তোকে দেখে গেছে। তোর প্রাণ থাক্‌লে তুই আনন্দে মাতাল হ'য়ে লুটিয়ে পড়তিস্। এই ফুলের রাজ্যে এত ফুল থাক্‌তে তোকেই কে তার পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছে! তুই আমার সাথী হ'য়ে থাক্; আজ থেকে আমি বিরহী; তবু তোকে আমি হিংসা কর্‌বো না। বলিয়া অক্লেশে সে ফুলটিকে পকেটের ভিতর গুঁজিয়া দিল।

তারপর কাজের কথা—

জানা গেল, নাম অজয়া; অবিবাহিতা; সুরেন নাম- ধারী কে এক ব্যক্তি উমেদার আছে—তবে সে আমল পায়নি।……

ভাবিতে ভাবিতে সহসা তার চিন্তা চপলতা ছাড়িয়া গম্ভীর হইয়া উঠিল।

......ব্যূহ রচনা করিতে হইবে। এই নারী পৃথিবীর উপর মাত্র পা দু'খানি রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে .....অন্তর তার গূঢ়ান্বেষী ......কল্পলোকে সে ফুল ফুটাইতেছে।......চোখে তার স্বপ্ন-কুহেলিকা; মনে অহমিকা; তাহার সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

...যে সুখদুঃখ এতদিন তাহাকে আলোড়িত করিয়াছে তাহা সিদ্ধার্থের কাছে আজ অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ হইয়া গেল।—যার নাম আজ সে বহন করিতেছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার প্রাণে যে ব্যথা নিরতিশয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সীমাহীনতার আলেখ্যই এই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র।

......সিদ্ধার্থ মনে মনে প্রস্তুত হইতে লাগিল—

আগে চিন্তা, পরে কাজ।

(৪)

জলের চেয়ে রক্ত গাঢ় ইহা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই কথাটি যে, রোগের বীজের মত অভ্যাসও যেন রক্তের আশ্রয়েই চিরজীবী হইয়া থাকিতে চায়।

এই কথাটি সিদ্ধার্থ সময় সময় ভুলিয়া যায়; সে ভাবে, তার মস্তিষ্কের বিচ্যুতি, আত্মবিস্মৃতি; মনে করে, যা' করিতেছে তা' ছাড়া উপায়ান্তর নাই; কিন্তু অনতিবিলম্বেই চেতনার মূর্চ্ছা কাটিয়া সহস্র দিকে সহস্র পথ দেখিতে পাইয়া তার মর্ম্মদাহের অন্ত থাকে না।...যে পথে সে হঠাৎ এক সময় চলিতে থাকে সে পথে তাহাকে লইয়া যায় তার বিভ্রান্ত আত্মবিস্মৃতি নহে, তার বিগত এবং বিস্মৃত অভ্যাস।

অতিশয় হীনসংস্রবে জীবনের দীর্ঘদিন সে কাটাইয়াছে—

তাই তার আহরিত শিক্ষার ফলটীকে আবৃত করিয়া মাঝে মাঝে পাঁকের বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতে থাকে।

—মদনের আজ কি কান্না, দিদিমণি! বলিয়া হাসিমুখে ননী আসিয়া দাঁড়াইল।

ননীর পরিচয়টা দি—

কিন্তু ননী অজয়ার কে তাহা সংক্ষেপে ঠিক করিয়া বলা কঠিন ; অন্য কোথাও হয় তো এরূপ অবস্থায় প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কই দাঁড়াইত—

কিন্তু অজয়া তাহাকে নিম্নস্তরের ভিতর কুড়াইয়া পাইয়াও সখীর আসন দিয়াছে।

ননীকে খাটাইতে অজয়ার বাধে না—

ননীও, যেন নিজেরই সব, এমনি করিয়া আগ্‌লায়।

অজয়া সেলাই কবিতেছিল—

মদনের কান্নার সংবাদে মুখ তুলিয়া বলিল,—তোর ধারা পেয়েছে বুঝি ! আমার গান শুনে নিশ্চয়ই।

—না গো না ; তা হ'লে ত' বুঝতাম, লোকটা কেবল রাঁধে না, কাঁদতেও জানে।

—তবে ?

—শোনো মজা। আমি বসে' কি একটা কর্‌ছি, মদ্‌না কোথা থেকে ছুটে এসে আমার সাম্‌নে বসে পড়েই হু হু করে' চোখের জল ছেড়ে দিলে। জল কি দু'এক ফোঁটা ! ঘড়া ঘড়া গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি বলি, কাঁদিস্ কেন, কাঁদিস্ কেন ? মদ্‌না কেবল বলে, আমি ম'রে যাব। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ী থেকে খারাপ খবর এসেছে ? বললে, না। তারপর কায়ক্লেশে কান্নার কারণ যা' বল্‌লে তা' তোমাকে বল্‌তে বারণ করে' দিয়েছে। বল্‌ব কিনা ভাবছি।

ননী বলিতেই আসিয়াছিল—

"বল্‌ব কিনা ভাবছি" বলিয়া সে অনর্থক অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অজয়া বলিল,—আমি শুন্‌তে চাইনে; কিন্তু কান্না থেমেছে ত?

—আপাততঃ মুলতুবী আছে, কিন্তু জল কখন আবার নাব্‌বে তার কিছু ঠিক নেই। তোমাদের খাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে, ঘটনা এম্‌নি সাংঘাতিক। সে বল্‌তে বলেছে দাদাবাবুকে, কিন্তু তোমাকেই বলি; তুমিই না হয় তাঁকে ব'লো। ছেলেবেলা থেকেই নেশাটা আস্‌টা করে, গাঁজা খায়। এখন, কলকাতা থেকে সম্বল যা' এনেছিল তা' প্রায় শেষ করে' এনেছে। এ মুল্লুকে আব্‌গারী দোকান বোধ হয় নেই; ফুরিয়ে গেলে কি হবে তাই ভেবে সে ক্ষেপে উঠেছে। তোমরা যদি পরিচিত কাউকে চিঠি লিখে ভরিটাক্‌ আনিয়ে দিতে পারো তবেই বাঁচবে, নতুবা সে লাফিয়ে বেড়াবে কি বিছানা নেবে তা' সে জানে না।

অজয়া হাসিতে লাগিল; বলিল,—মিলেছে সব ভালই। বলিস্‌ তাকে, আনিয়ে দে'য়া যাবে।

—তুমি শুনেছ সে যেন জান্‌তে না পারে। জান্‌তে পেলে আমায় মাছের কাঁটা খাইয়ে মারবে।

মদন অজয়াদের পাচক।

অজয়া বলিল,—তুই মলে' ত' আমি বাঁচি, হাড় জুড়োয়।

—তাই ব'লে কি আজই বিদায় করতে চাও? তা' আমি যাচ্ছিনে। তোমার চেয়েও আমার যে আপনার তাকে তুমি এনে

দেবে, তাকে দেখে' তবে আমি মরব ··অবিশ্যি যদি তখন মনে পড়িয়ে দাও।

—তবেই তুমি এ জন্মে মরেছ। তালগাছ···

দরজার বাহির হইতে হঠাৎ একটা ফুলের তোড়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল—এবং দুপ্‌দাপ্‌ পায়ের শব্দ মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত শোনা গেল···

—কে রে?

ননা বলিল,—আর কে রে! সে পালিয়েছে।

—দেখত, ননা কে।

ননা বাহিরটা দেখিয়া আসিল ..কিন্তু রাস্তা জনশূন্য। বলিল, —কেউ কোথাও নেই ত।

ইতিমধ্যে অজয়া তোড়াটি তুলিয়া লইয়াছে। সেটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—সুন্দর তোড়াটি ত! সাজিয়েছেও বেশ—সাতভাই চম্পার মত সাতটি ফুল, মাঝখানে একটি স্থলপদ্ম।···এ কি!

স্থলপদ্মের মৃণালের সঙ্গে ছোট একখানা কাগজ জড়ান' রহিয়াছে -

অজয়া সেখানা টানিয়া বাহির করিল—পরিস্কার হস্তাক্ষরে তাহারই নাম লেখা—আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলিয়া সে নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল······অল্প অল্প হাসিতে লাগিল—যেন গল্প লিখিতেছে।

কিন্তু হাসিতে হাসিতে অজয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল ; এবং এমনি সময় রজত বেড়াইয়া ফিরিল।

অজয়ার ও ননীর মুখের দিকে চাহিয়া রজত বলিল,—তোমরা যেন আকাশ থেকে পড়ে' হাঁ করে' বসে' আছ ! ব্যাপারখানা কি ? তোমার হাতে ও কাগজ কিসের ? কোনো ছঃসংবাদ আসেনি ত ?

—না। পড়ে' দেখো।

—তবু ভাল। বলিয়া কাগজখানা হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়া রজত পা ছড়াইয়া দিল। এবং আলোর সম্মুখে কাগজখানা ধরিয়া টিপ্পনী জুড়িয়া জুড়িয়া পড়িতে লাগিল,—

"নিরানন্দস্থানে একটি নিষ্পত্র বৃক্ষ ; তারি একটি ডালে দড়ি বেঁধে এক ব্যক্তি তার ধিক্কৃত অসহ্য জীবন শেষ করতে এসেছিল।—(সর্ব্বনাশ !)—দড়ি বাঁধছে এমন সময় একটা পাখী এসে সেই গাছেরই ডালে বসে' গান সুরু করে' দিলে।—(হতভাগা পাখী।) —যে মরতে এসেছিল সে ভাবলে, যখন পৃথিবীতে এত নিরানন্দ স্থান কোথাও নেই, যেখানে পাখী গান করে না তখন আমি বাঁচব'। —(উত্তম প্রস্তাব।)—

এই পাহাড়ে আমি এসেছিলাম জীবনে বীতস্পৃহ হ'য়ে মরতে। —(ঠিক)—ইতিমধ্যে তোমায় দেখ্‌লাম"—

এইখানে রজত কাগজখানা উল্টাইয়া শিরোনামাটি পড়িল। অজয়া তাহাতে অকারণেই লজ্জা পাইয়া মাথা নোয়াইল।

—তারপর মহাশয় লিখ্ছেন,—বলিয়া আরম্ভ করিয়া রজত পড়িতে লাগিল,—

"কে যেন আমায় বাঁচতে বল্লে।—(পাখী টাখী হবে।)—আমি বাঁচব। (খাসা কথা।)—

আমি বাঁচি কি মরি তোমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি! (কিছুই না।)—আমি আজই এস্থান ত্যাগ করে' যাবো; তুমি জান্তে পার্বে না, কাকে তুমি বাঁচিয়েছ; কে তাই তোমায় এমন হঠাৎ জানিয়ে গেল।"—কাগজের দিকে চাহিয়াই রজত বলিতে লাগিল,—সমাপ্তির ইতি নেই, স্বাক্ষর নেই, তথাপি ধন্যবাদ তোমায়, হে অজ্ঞাতনামা। ··আত্মহত্যা মহাপাপ—তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে সে দৃশ্যটাও উপভোগ্য হ'ত না।—এত লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়, পাগলের মত চেহারা ত' কারো দেখিনি!—ননী, চা। আমি তার স্বাস্থ্য পান করবো।—বলিয়া রজত তেমনি নিঃস্পৃহ আল্‌গা সুরেই শেষ করিল।

কিন্তু ঐ কাগজ উল্টাইয়া ঠিকানাটা দেখিবার পর হইতেই যে তাহার হাল্‌কা কণ্ঠের সরসতায় ঘুণাক্ষরের মত একটা দ্বিধার দৌর্বল্য মিশিয়া গিয়াছিল তাহা বোধ হয় নিজেও সে অনুভব করিতে পারে নাই; পারিয়াছে কেবল নারী দু'টি।

ননী নিঃশব্দে চা আনিতে চলিয়া গেল।—

এবং অজয়া যখন দাদার দিকে চোখ ফিরাইল তখন তাহাতে তাহার হৃদয়ের সুকোমল প্রসন্নতার ছায়ামাত্রও নাই।—

ব্যাপারটা যে বড় অস্বাভাবিক।

কিন্তু অজয়া স্বাভাবিক স্বরেই বলিল,—পাগলের কর্ম্ম এটা নয়। নানারকম খোঁজ নিয়েছে,...আমাদের দেখেছে, বাড়ী চিনে গেছে'। কাগজখানা দাও ত, রেখে' দি।

রজত বলিল,—এ-পাহাড় ও-পাহাড় করে' বড্ড বেড়িয়েছি আজ। বেড়াতে বেড়াতে এম্‌নি তন্ময় হ'য়ে পড়ি যে ক্ষিদে ভুলে যাই।

—তুমিই একদিন বিপত্তি ঘটাবে দেখ্‌ছি; গহ্বরে পড়ে তলিয়ে যাবে, কি গড়িয়ে প'ড়ে মাথা গুঁড়ো করে' আস্‌বে।

—পাগল! তন্ময় হ'য়ে পড়ি বলে' কি চোখ বুঁজে' চলি? হাত-পা-মাথাকে আমি যথেষ্ট ভালবাসি, তাদের মঙ্গল অমঙ্গল বিষয়ে আমি খুব সজাগ......দেহে জোর পেয়েছি কত! মনে হয় যেন পাহাড়ের মাথাটা ধরতে পারলে তাকে নুইয়ে এনে ধনুকের মত গুণ পরাতে পারি।

—তা পার কিনা জানিনে, কিন্তু একটা কথা রাখ্‌বে?

—কি কথা? খুব ভারি কি?

—কথা দাও, এই কথাটা আর কখনো তুলবে না।

—কোন্ কথাটা?

—এই চিঠির কথাটা।

—দায় পড়েছে; আমি ত ছেলেমানুষ নই যে ঐ খেল্‌না পেয়ে দিনরাত খেলা ক'রব।

—তা' জানি ; কিন্তু এই ঘটনার সংস্রবে আমার লজ্জাটা কোথায় তা' তুমি বুঝেও হয় তো বুঝবে না ; তোমার তাই সতর্কতার অন্ত থাকবে না, পদে পদে আমায় লজ্জা দেবে।

শুনিয়া রজত হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিল,—তা' দেব না ; তবে সাবধানে থাকা দরকার বৈ কি। যদি পাগল না হ'য়ে চোর হ'ত?—মদন মাণিক কর্‌ছিল কি? ডাকো তাদের।

মদন হাত জুড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল—

মাণিক তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল।

অজয়া বলিল,—মদনের আট আনা জরিমানা ; মাণিকের এক টাকা। তোরা কি ঘুমুচ্ছিলি?

চোখ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সে ঘুমায় নাই—ইহাই মনে করিয়া মাণিক মদনকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া স্পষ্ট প্রকট হইল—

হাজার হোক্ সে বাঙ্গালী।

বলিল,—না, দিদিমণি, সন্ধ্যেবেলাই ঘুমুবো কেন!

—তবে কি কাজে তন্ময় ছিলে যে একটা বাজে লোক বাড়ীতে ঢুকে বেরিয়ে গেল ; তোমরা কেউ তার আওয়াজ পেলে না—কেন?

অপরাধ সত্যই ঘটিয়াছে—তর্ক বৃথা, কান্নাকাটি প্রতিবাদ

কৈফিয়ত সবই এখানে এবং এখন বৃথা, মাণিক তাহা জানে। শাস্তি মানিয়া লইয়া নিঃশব্দে একটা সেলাম বাজাইয়া মদনকে টানিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল।—

ননী চা দিয়া গেল—

লম্বা করিয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া রজত বলিল,—এদিক্‌কার ত' সব একরকম মিট্‌ল'। এখন আমার চায়ের কি হবে তাই হয়েছে ভাব্‌না।

অজয়া বলিল,—আমারও সেই ভাবনাই হয়েছে।

—আমি তোমার দাদা হই। আমি খালি ভাবি না, কাজও করি। আমার ইচ্ছে যে, আমার বোনটিও ঠিক তেম্‌নি হয়।

—একটি দাদা থাকা মন্দ নয়, সব বিষয়েই ভাল; কেবল যদি—

—গান গাইতে না বলে তবেই ষোল-আনা ভাল হয়—এই না কথার শেষ কথা তোমার? কি করবো দিদি! ভগবান সব দিয়েছেন, শুধু কণ্ঠে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু সে-ক্ষতি পূরণ করে' দিয়েছেন তোমায় আমার বোন করে'...চা-টা মাটি করেই দিলে। ননী, দিদি আমার, আর এক পেয়ালা—যদি পারো, যদি অসুবিধে না হয়, যদি—

অজয়া জোগাইয়া দিল,—না ঘুমিয়ে থাকো।

ননী পাশের ঘর হইতে বলিল,—ঘুমুইনি, আন্‌ছি।

এতগুলি কথার খরচ হইল শুধু এই কারণে, যে রজত সন্ধ্যা-বেলায় চায়ের সঙ্গে একটি করিয়া অজয়ার গান শোনে—

তার নাকি মনে হয়, চায়ের সঙ্গে ঐ গানটি না শুনিলে ব্যাপার সঙ্গীন্ হইয়া এমন কি তার ক্রোধের উৎপত্তিও ঘটিতে পারে।

কিন্তু আজকার মত রাগের কারণ ঘটিল না।

(৮)

ফুলের তোড়াটি অজয়ের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া আসা অবধি সিদ্ধার্থর মন ভাল নাই। কাজটি করিয়া ফেলিয়াই তার মনে টিস্‌টিস্‌ করিতে লাগিল, কোনই প্রয়োজন ছিল না, ঘটনা তাহাতে কিছুমাত্র অনুকূল বা অগ্রসর হয় নাই।—কেন যে ঐ বুদ্ধিটা হঠাৎ ঘটে আসিল, ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরেই উত্তেজনার নিবৃত্তি হইয়া সেইটাই তাহার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিল।

যাই হোক্‌ সিদ্ধার্থ সিদ্ধিদাতা গণেশের পাঁচসিকে ভোগ মানত করিয়াছে।

উল্টাইয়া না পড়া পর্য্যন্ত গণেশ ঠাকুরকে কেহ বড় স্মরণ করে না; সিদ্ধিপ্রদানের প্রার্থনাসহ কিঞ্চিৎ ভোগের আশা গণেশ বোধ করি এই প্রথম পাইলেন।

ডাকাতরা কালী পূজা করিয়া লুঠতরাজে বাহির হয়—কিন্তু তাহাতে খরচ বেশী, শব্দও বেশী—

সিদ্ধার্থ তাই নিঃশব্দে নিরীহ গণেশের শরণাপন্ন হইয়াছে।

সঙ্কল্প তাহার সাধু সন্দেহ নাই—

রজতের সে পিছু লইয়াছে।—রজত পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়; যদি দৈবাৎ সে পা পিছ্‌লাইয়া পড়ে, পা একখানা মচ্‌কিয়া—

রজত নিজে না পড়ুক, পাথরই একখানা গড়াইয়া পড়ুক না তার পায়ের উপর—কাঁধে করিয়া রজতকে সে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে।

তখন ······

ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধার্থর মনে হইল, সে যেন রজতকে কাঁধে করিয়াই চলিয়াছে—

প্রথমেই একটি চমকিতার চঞ্চল ব্যাকুলতা—

তারপর ধন্যবাদ; দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির প্রথম মিলন—

তারপর দু'চারিটি কথা, পরিচয়ের সূত্রপাত—

তারপর হয়তো নিমন্ত্রণ—

তারপর ···

কিন্তু নিশ্চিন্ত গণেশের উপর অবিশ্বাস আর বিরক্তিতেই তারপর যে কি ঘটিবে তাহা সিদ্ধার্থর চিন্তা করা ঘটিয়া উঠিল না।

সিদ্ধার্থ মনে মনে একটু হাসিল—

যে কাজের সূচনাই হয় নাই, তাহাকে বাষ্পীয় কল্পনার বলে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অতদূর লইয়া যাওয়া অনর্থক! ······ তবু ছবিটা ভাল ··· মনে মনে সাজাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

স্থান কাল উভয়ই মনোরম।

বায়ুমণ্ডল একেবারে নিঃশব্দ—মনে হয়, কোথাও একটু শব্দ হইলেই সে শব্দের আর শেষ হইবে না ···ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি আসিবে আর যাইবে।

অন্ধকার কোথায় যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া গহ্বরে নিদ্রিত ছিল; বাহিরে আসিয়া ক্রমাগত সে দেহ বিস্তৃত করিতেছে; গাছের মাথায় মাথায় আলোর স্পর্শ ছিল—তাহাও সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়াই সরিয়া গেল।

কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটিতে আসে—

তাহারা ঘরে গেছে। ······

সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিল, রজত এই দিকে উঠিয়া গেছে; এখনো তার নামিবার তাড়া নাই কেন!

কিন্তু তাড়া তার ছিল; এবং তখনি তার প্রমাণ আসিল—একটি আর্ত্ত চীৎকার।

সিদ্ধার্থ কান পাতিয়া রহিল—

পর্ব্বতমালার গায়ে গায়ে আছাড় খাইয়া খাইয়া সুগম্ভীর শব্দটার মৃত্যু ঘটিতে বহু বিলম্ব হইল···

শব্দটা শেষ হইলে সিদ্ধার্থ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল···গণেশের কৃপা হইয়াছে। সিদ্ধার্থর অন্তরটাই যেন আবর্ত্তিত হইয়া অতীব ক্রুর একটি হাসির আকারে দেখা দিল······

চমৎকার—

ঘেমে উঠেছে; ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল চক্ষু দিগ্বিদিকে দৃষ্টি হেনে'

বেড়াচ্ছে ; আতঙ্কের আতপে গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠেছে ; পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে চক্ষু দু'টি এক একবার নিস্পলক হ'য়ে বুকের স্পন্দন থর্ থর্ করছে ; পৃথিবীময় সে মনে মনে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে মানুষের একখানি মুখ ; বাঘের থাবার নীচে মৃগীর মত তার কাঁপুনি……চমৎকার ছবি !

বিপন্ন রজতের এই চমৎকার ছবিখানি কল্পনা করিতে করিতে সিদ্ধার্থ উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া শব্দের দিকে উঠিয়া গেল।—

রজত উপরে—

সিদ্ধার্থ নীচে ; উঠিয়া আসিতেছে।

সিদ্ধার্থকে দেখিয়াই রজতের মনে হইল, সে যেন মানুষের আর্ত্তরক্ষার সহজ আগ্রহ।…কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ঠ্যাঙ্গাড়ে' নয় ত' !

সিদ্ধার্থর হাতে ছিল অতিকায় এক লাঠি, আর কাঁধে ছিল ব্যাগ।—

ঠ্যাঙ্গাড়ে' সন্দেহ করিয়া ভয় পাইবার অবস্থা রজতের তখন নয় …সিদ্ধার্থ যে মানুষ তখনকার মত সেই তার যথেষ্ট।—নির্ণিমেষ চক্ষে সে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল।

…সিদ্ধার্থ উঠিয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইতেই রজত তাহাকে মহা ব্যগ্রভাবে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—বাঁচালেন।

সিদ্ধার্থ বলিল,—ছাড়ুন আর বসুন। আমি শ্রান্ত।

রজত বলিল,—বাঁচালেন যে সে ত' মিথ্যে নয়। কি করে' যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাব তা' ভেবে পাচ্ছিনে।

—ভেবে যখন পাচ্ছেন না তখন ত' নিরুপায়; আর কৃতজ্ঞতা একটা কুসংস্কার।

—সে তর্কের সময় এখন নেই। তবে আমি যে মর্‌তাম সে বিষয়ে বোধ হয় আপনারও সন্দেহ নেই।

সিদ্ধার্থ হাসিয়া বলিল,—শুনেছি, এই পাহাড়ে বালখিল্য মুনিগণের প্রেতাত্মারা সব বাস করেন; মানুষকে একা আর দুর্ব্বল পেলেই তাঁরা তার পথ ভুলিয়ে দিয়ে অনিষ্ট করে' থাকেন।

—বালখিল্য মুনিরাই ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ; তাঁদের প্রেতাত্মারা আর কত ভয়ঙ্করই হবেন! ভয়ের কারণ ঠিক ওদিক দিয়ে নয়—বাঘ ভালুক চরে' বেড়ায় না কি?

—বেড়ায় বলেই জনরব, কিন্তু হিংস্র জন্তু যাকে মারে সে না কি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে না—মৃত্যু আস্‌ছে দেখেই তার চেতনা যেমন নিশ্চেষ্ট তেম্‌নি অসাড় হ'য়ে যায়। সে বড় সুখের মৃত্যু। সে কথা যাক্—আপনি বোধ হয় ক্ষুধার্ত্ত; আমার সঙ্গে খাবার আছে।—বলিয়া ব্যাগ্ খুলিয়া গরম দুধের বোতল, পাঁউরুটি, জেলি প্রভৃতি বাহির করিতে লাগিল।

রজত বলিল,—ক্ষিদেটা এতক্ষণ অনুভব করবার অবসরই পাইনি—তৃষ্ণাটাই মারাত্মক হ'য়ে উঠেছিল।...এখন বুঝ্‌তে পারছি আমি মনঃসংযোগ না কর্‌লেও ক্ষিদেটা আপন মনেই বেড়ে উঠেছে!

—আসুন, তবে খাবারগুলোকে কাজে লাগান' যাক্।

ক্ষিদেটাকে স্থায়ী হ'তে দিলেই শেষ পর্য্যন্ত পীড়ন করে' কম, কিন্তু ক্ষয় করে' দুর্ব্বল করে বেশী। দুর্ব্বল হ'লে আপনার চল্‌বে না; পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামা কঠিন।

—সে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। কিন্তু আমি খুব আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আমার এগুলি দরকার হবে তা' আপনি যেন জানতেন।

সিদ্ধার্থ একটু হাসিল মাত্র।

রজত বলিল,—আপনি এসে না পড়লে আমাকে বাঘে খেত; তাকে ফাঁকি দিয়ে আমি নির্ব্বিবাদে দুধ রুটি খাচ্ছি।—বলিয়া রজত হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল।—

চাকা কেবলি ঘুরিতেছে।

বলসঞ্চয় করিয়া লইয়া রজত বলিল,—এইবার বেশ মজবুত বোধ কর্‌ছি। আপনাকে দেখবার পরও ত্রাসভোগের যে গ্লানিটুকু ছিল তা' দুধ-রুটি খেয়েই গেছে। কিন্তু কথায় কথায় ভুলে যাচ্ছি যে, অন্ধকার যত ঘনাচ্ছে, আমার বোনটি তত উতলা হ'চ্ছে।

—উঠুন। বলিয়া সিদ্ধার্থ হাতে লাঠি আর কাঁধে ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রজত বলিল,—উঠেছিলাম অনেক হাঙ্গামা পুইয়ে, শিকড় আর গাছগাছড়া ধরে' ধরে', নাম্‌ব কি ধরে'?

—আমার কাঁধ ধরে'।...পা যেন টলে না; সমস্ত শরীরের ভার আমার ওপর এলিয়ে দিন; দু'জনের ভার রাখবে এই লাঠি;

তাড়াতাড়ি করবেন না, পা ফেলবেন খুব সাবধানে—আলগা পাথর এড়িয়ে। আসুন!

রজত ভাবিল, এই রকম বলিষ্ঠ দেহ তাহার হইলে তবু কিছু নিশ্চিন্ত থাকা যাইত, বিশেষ করিয়া এই আসুরিক শক্তিপ্রতিযোগিতার যুগে।...

সিদ্ধার্থ ভাবিল,—লুকাইয়া নয়, চোখের সম্মুখে তাহাকে দেখিব।...

(৬)

অজয়া পেন্সিলে ছবি আঁকিতেছিল—

পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি পল্লী; তার পশ্চিম প্রান্তে রৌপ্য-প্রবাহের মত নদীটি; নদীর ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র; ক্ষেত্রের সীমান্ত ব্যাপিয়া দিক্‌চক্ররেখা···তারি নীচে সূর্য্য অর্দ্ধেক ডুবিয়া গেছে।···এদিকে রাখাল বালকেরা গরু ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে; মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া তাহারা মন্থরগতিতে চলিয়াছে; গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা; কোনোটি নিজের বাড়ীর কাছে আসিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে; কোনোটি ঘাড় ফিরাইয়া পিছাইয়া-পড়া বাছুরের দিকে চাহিয়া আছে।···

দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ননীর মনে হইল, চিত্রাঙ্কন ভালই হইতেছে। বলিল,—ভারি সুন্দর! এটা কিসের ছবি, দিদিমণি?

অজয়া বলিল,—দেখে কিচ্ছু বোঝা যায় না, তবু "ভারি সুন্দর" কি ক'রে বল্‌লি?

—আমি যা বুঝেছি তাতে এ গোষ্ঠ। কিন্তু গোপীরা কই, মা যশোদা?

—তারা একটু বিলম্বে আসবেন ; হেঁসেলে আছেন। বলিয়া অজয়া হাসিতে লাগিল ; কিন্তু ননী গম্ভীর হইয়া গেল। "গোষ্ঠ" প্রভৃতি লইয়া ঠাট্টা ননী ভালবাসে না।

—আলো দিয়েছে, ঘরে চল্। বলিয়া অজয়া ননীর মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল ; বলিল,—ক্ষমা কর্, ননি ; আমার মনে ছিল না।

ননী হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—আমার কাছে তোমার অত ভণিতা নকুত্তা কর্‌তে হবে না ত।

—আলবৎ হবে। বলিয়া অজয়াও হাসিতে লাগিল।·· সমগ্র ব্যাপারটি দু'একটি কথা উচ্চারিত হইয়াই শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু উভয়ের পরস্পরের প্রতি যে প্রীতির মধু ছিল তাহা অতিশয় নিবিড় হইয়া দু'জনাকেই কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্ করিয়া রাখিল।

ননী ল্যাম্পটার দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—আলোয় এলে আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়, দিদিমণি।

—তোর হবার ত' কথা নয় ; জান্‌তাম যে, চোর আর প্যাঁচারই কেবল আলো সয় না।

—তুমি ছবি আঁকো বটে, কিন্তু বাইরের সঙ্গে মনের মিলের কথা তুমি ধর্‌তে পারো না।·· অন্ধকার যত গাঢ় হয় তত সে স্পষ্ট ; আলো যত উজ্জ্বল তত সে ধাঁধাঁ লাগায়। আমার মনে হয়, আলোয় যত অকল্যাণ অন্ধকারে তত নয়—মানুষ উল্টোদিকে যতই বলুক্ না।

—তা হবে ; কিন্তু আমার বাঁ চোখ্‌টা নাচ্‌ছে কেন বল্‌ ত—এটাও ত' বাইরের সঙ্গে মনের মিলের কথা।

—দাঁড়াও মনে করি···"সীতা আর রাবণের কাঁপে বাম অঙ্গ।"

—তার মানে ?

—বাম অঙ্গের কাঁপুনি আমাদের পক্ষে শুভ আর পুরুষের পক্ষে অশুভ সূচনা করে।··তোমার সু-খবর বুঝি দাদাবাবুই আন্‌ছে।

—দাদার এতক্ষণ ত ফেরা উচিত ছিল, ননি ; আমাকে ফাঁকি দিয়ে রেখে গেল, সঙ্গে নিলে না ; বলে' গেল, সন্ধ্যার আগেই ফিরবো।

—কেউ হয়তো নতুন রকম চায়ের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেছে ; গিয়ে গল্পে ডুবে গেছেন।

—না, ননী ; আমার বড় ভাবনা হ'চ্ছে। এই পাহাড়ে' দেশে বিপদ পদে পদে ; পথ ভুলেই হয়তো ঘুরে' মরছে। মাণিককে ডাক্‌, সে একটা লণ্ঠন নিয়ে—

বলিতে বলিতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া অজয়া থামিয়া গেল।

—বেশ লোক তুমি। সন্ধ্যার—

অজয়াকে দ্বিতীয়বার কথার মাঝখানেই থামিয়া যাইতে হইল ; রজতকে দরজার সম্মুখে দেখিয়াই সে আরম্ভ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পশ্চাতে সিদ্ধার্থকে দেখিয়াই সে থম্‌কিয়া গেল।

সিদ্ধার্থকে বসাইয়া রজত বলিল,—ইনি আমার ভগিনী অজয়া, অজয়া—

সিদ্ধার্থ বলিল,—আমার নাম সিদ্ধার্থ বসু।

উভয়কে নমস্কার বিনিময়ের অবসর দিয়া রজত বলিল,—আমার নূতনতম বন্ধু। প্রধান কথাটি পরে বল্‌ছি তোমাকে।·· সন্ধ্যার আগেই ফেরবার কথা ছিল বটে ; কিন্তু এ সন্ধ্যা ত' দুর্ব্বাসার সেই সন্ধ্যা নয় যে ভস্ম হবার ভয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকবে ! কাজেই অন্ধকার অকুতোভয়ে বেড়ে' গেল।···তারপর বল্‌ব সবটা ? বলিয়া সিদ্ধার্থর দিকে চাহিয়া সে প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু সিদ্ধার্থ কেমন ভয়ে ভয়ে অজয়ার দিকে একবার চাহিয়া লইল···বুক তাহার অকারণেই দুরু দুরু করিতেছিল। কথা যখন সে কহিল তখন নিজেরই কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন এখানে খাপ্‌ছাড়া।

এবং তাহার কণ্ঠ যে একটি দুর্ব্বোধ্য বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ফুটিবার পথ পাইল তাহা যেমন তাহার তেম্‌নি আর দু'জনেরও বুঝিতে বাকি রহিল না।

বলিল,—অনাগত ভয়কে উপেক্ষা করবে, ভয় এসে পড়লে উদ্ধারের উপায় দেখ্‌বে, এই নীতি শাস্ত্রে আছে। উদ্ধারের পরে বাড়ীতে এসে গল্প করা উচিত কি না তার কোনো উপদেশ দেওয়া নাই।

রজত বলিল,—কারো অজয়ার মত ভগিনী আছে জান্‌লে শাস্ত্রকার চারিদিকে যেমন দিয়ে গেছেন, তেম্‌নি এদিকেও একটা

দাগ কেটে' দিয়ে যেতেন ; সম্ভবতঃ নিষেধ করেই যেতেন ; তাঁদের নিষেধের হাত খুব দরাজ ছিল।

অজয়া বলিল,—কেন শুনি ?

—কারণ আজকার গল্পটা যদি করি তবে কাল থেকে আমাকে বাড়ীতে নজরবন্দী হ'য়ে থাকতে হবে, কিম্বা খবরদারী করতে সঙ্গে একটা পাইক তুমি জুড়ে দেবে।

অজয়া এতক্ষণে সিদ্ধার্থর দিকে ফিরিল।

সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—দাদা এখন বল্‌বে না, ঝোঁক আসেনি'। আপনি বলুন ; সঙ্গে পাইক জুড়ে' দেবার ভয় বোধ হয় আপনার নেই।

অজয়ার এই দ্বিধাহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টি সিদ্ধার্থর একটি স্থানে একটি নিমিষের জন্য অতর্কিত একটা ধাক্কা দিয়া গেল...

ঠিক্ এম্‌নি সজীব অথচ নির্লিপ্ত স্পষ্টতা তার সম্মুখে লোকাতীত হইয়া আজ এই প্রথম দেখা দিল...তার কোথাও ক্লেশ নাই, ক্লেদ নাই, আধ-আধ ভাব নাই, প্রয়াস নাই।—

সিদ্ধার্থ একটু নড়িয়া বসিয়া রজতের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল ; রজত চোখের ইসারায় সম্মতি দিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সিদ্ধার্থ অজয়ার মুখের দিকে অকাতরে চাহিয়া থাকিবার একটুখানি সঙ্গত শোভন কারণের সন্ধানে মনে মনে দিগ্বিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিলেও, কারণটি হাতে আসিয়া পড়িতেই সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরটি অতিশয় সঙ্কুচিত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

...একবার টেবিলের দিকে চোখ নামাইয়া, একবার অন্ত-দিকে চাহিয়া, একবার অজয়ার দিকে চোখ ফিরাইয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল,—আপনার দাদা উঠেছিলেন পাহাড়ে, সকলের শেষটায়, যেটার নাম শিবজটা। খানিকটা দূর উঠলেই শাণ-বাঁধানো মেঝের মত সমতল খানিকটা জায়গা আছে—তার পেছনদিকে শিবজটা নিজে, একেবারে খাড়া; দক্ষিণে জঙ্গল, উত্তরে ঝরণার নদী; পূবদিকে পায়ে পায়ে পথ পড়ে গেছে, তাই বেয়ে উঠেছিলেন বোধ হয় গাছের ডালপালা ধরে...ওঠা তেমন কঠিন নয়...কিন্তু নাম্‌বার উপক্রমেই বুঝতে পার্‌লেন কাজটি দুরূহ...চোখ বুজে পা ফেল্‌তে হয়, কোনো অবলম্বন নেই... কাজেই, হঠাৎ পা আল্‌গা পাথরের উপর কি পিছল জায়গায় পড়লেই—

রজত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—সিদ্ধার্থবাবু, থামুন; এইবার আমি বলি—আমার ঝোঁক এসেছে।...আট্‌কা পড়ে' আমার মনের অবস্থাটা কেমন হ'য়েছিল তা' উনি জানেন না।...নতুন রকমের অভিজ্ঞতা।...এখন হাসি পাচ্ছে, কিন্তু তখন সমস্ত পৃথিবী চোখের সাম্‌নে, ঢিল্‌টি যেমন জলের নীচে নেমে যায়, তেমনি করে' অন্ধকারের ভেতর ডুবে যাচ্ছিল—বেশ আস্তে আস্তে, জানিয়ে জানিয়ে।...সেই অন্ধকারের ভেতর জেগে' ঝক্‌ঝক্ করছিল শুধু নরকঙ্কাল...আর প্রেতের দল সার বেঁধে শোভা-যাত্রায় বেরিয়েছিল...তাদের অট্টহাসির শব্দ যেন কানের গা ঘেঁসে' করতালি বাজাচ্ছিল।...একটু অত্যুক্তি হ'ল—কিন্তু ভয়

যে কল্পনা নয়, তা' আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি।...আমার চোখের তারার উপর একটা সাদা পর্দ্দা নেমে' এসেছিল কি না জানিনে; তবে অন্তিম তৃষ্ণা আর অন্তিম ঘর্ম্মের ব্যাপারটা সুখের আর সখের বলে' কখনো আমার ভুল হবে না।—বলিয়া রজতও অতিশয় আমোদ বোধ করিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু অজয়ার মুখ শুকাইয়া উঠিল।—

সিদ্ধার্থ বলিল,—আপনি যে অবস্থাটার বর্ণনা করলেন, তার-পরই ত' মূর্চ্ছা অনিবার্য্য।

—আপনার সাড়া না পেলে অজ্ঞান হ'য়ে যেতাম বৈ কি।... আমার যে চীৎকার আপনি শুনতে পেয়েছিলেন, সে স্বর কিন্তু আমারও অপরিচিত—যেন আমারই নয়...

অজয়াকে বলিল,—বুঝলে না?

—না।

সিদ্ধার্থ বলিল,—আমিও বুঝলাম না ঠিক্।

—প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে মানুষ যে আর্ত্তনাদ করে, সে স্বর তার কণ্ঠের পরিচিত স্বর কখনই নয়...সে স্বরের মধ্যে যে তার বিসর্জ্জনের ঢাক বাজে...পরে শুনলে সে চিনতেই পারবে না, এমন করে' সে চেঁচিয়েছিল।...সাপে-ধরা ব্যাঙের আওয়াজ কি তার নিত্যকার ব্যবহারের শব্দ?

বলিয়া রজত প্রসন্নমুখে নিঃশব্দ হইল—

কিন্তু অজয়া যেন চোখের সম্মুখেই অপমৃত্যুর একটা বীভৎস

দৃশ্য দেখিতেছে এম্‌নি আতঙ্কে চম্‌কিয়া তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল ; বলিল,—দাদা—

—আমার বেড়ানো বন্ধ, এই ত ? স্নেহে অন্ধ হ'য়ে মানব-চরিত্র ভুল বুঝো না। ন্যাড়া বেলতলায় যদি দু'বার না যায়, তবে আমিই বা কেন দ্বিতীয়বার পাহাড়ে উঠবো ! ননি, চা।

ননী চা আনিতে গেল।

এবং "আমি আসি" বলিয়াই সিদ্ধার্থ আচম্‌কা উঠিয়া দাঁড়াইল।

...সিদ্ধার্থ ইহাদের সম্মুখে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল... যেন সে একখানি ঘুর্ণায়মান চক্রের উপর বসিয়া আছে—

বিঘুর্ণিত চক্র যেমন তার পৃষ্ঠের উপর কোনো বস্তুকেই তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে দেয় না...তেম্‌নি একটি কাণ্ড ঘটিতেছিল সিদ্ধার্থর জ্ঞান-জগতে—তার জ্ঞান-জগৎটাই যেন অবিশ্রান্ত পাকের উপর পাক্ খাইয়া খাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছিল।

...অতীতের অপর কোনো মূল্য থাক্ আর নাই থাক্, একেবারে নিরুপায় হইয়া তাহাকে আঁক্ড়াইয়া ধরিলে সেই অবলম্বন সহ্য করিবার মত দৃঢ়তা তার থাকিলেই যথেষ্ট।...কিন্তু সিদ্ধার্থর তাহা নাই।...অতীত তার একেবারে শূন্য, তৃণের অঙ্কুরটি পর্য্যন্ত তার কোথাও নাই।

বর্ত্তমান তাই অকস্মাৎ অসহ্য প্রখর হইয়া নিজের কাছে বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে...

তার অযোগ্যতা একেবারে দুস্তর।

—সে কি? চা খেয়ে যান্। বলিয়া রজত টেবিলের উপর করাঘাত করিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—চা আমি খাইনে।

—অন্য ওজর দেখা'লে জোর কর্তাম। কিন্তু চায়ের সঙ্গে আমি চোখ বুজে' গান শুনে' থাকি, তাতে আপনার আপত্তি আছে?

সিদ্ধার্থ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—আজ থাক্, আনন্দটা আর একদিন এসে সম্পূর্ণ করে' নিয়ে যাব। বলিয়া ফেলিয়াই সিদ্ধার্থের মনে হইল, আর একটু বসিয়া গেলে ক্ষতি কি!

অজয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনি যে আনন্দ আজ আমাকে দিয়েছেন তার তুলনা নেই।

এমন প্রাঞ্জল গদগদ কণ্ঠ সিদ্ধার্থ আগে কখন শোনে নাই…

তার আশার মুকুল মুখ খুলিতেছে।—

বলিল,—কাজের গুরুত্ব যদি ফলের হিসাবে ধরা হয়, তা' হ'লে আপনার দাদাকে পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে গুরুতর কাজই করেছি—যার ফলে আমার মত নির্ব্বান্ধবের আপনাদের বন্ধুত্ব লাভ হ'ল।

রজত বলিল,—সে বন্ধুত্বের মূল্য বিচার করবার সুযোগ কখনো পাবেন কি না জানিনে; কিন্তু আমরা আপনার বন্ধুত্ব লাভ করবার আগেই আপনাকে দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে নিয়েছি।

বন্ধু বলে' যখন সম্মানিত করলেন, তখন বোধ হয় সমতল ক্ষেত্রেও আমাদের হিতের জন্যে আপনাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে' হবে—তখন তাকে দুর্দ্দৈব মনে করবেন না ত ?

—ঈশ্বর না করুন। যেদিন আপনাদের বন্ধুত্ব দুর্দ্দৈব মনে ক'রবো সেইদিন বুঝবো আমার দুরদৃষ্ট চরম সীমায় পৌঁছেচে। ...নমস্কার।

—নমস্কার, মাঝে মাঝে এলে বড় সুখী হবো।

অজয়া বলিল,—আস্‌বেন।

তাহাকেও নমস্কার করিয়া সিদ্ধার্থ বাহির হইয়া গেল।

...সিদ্ধার্থর শেষ কথা ক'টির অকপট আন্তরিকতা অজয়ার বড় মিষ্ট লাগিল—

কিন্তু মানুষের অন্তর্য্যামীই জানিলেন, সিদ্ধার্থ তাদের বন্ধুত্বই চরম আনন্দের বিষয়বস্তু বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে করে নাই—

তার ভয় কাটিতেছিল—সে নিজেকে ভুলিতেছিল...তার এই আন্তরিকতার জন্ম সেইখানে।

ননী চা আনিল।

অজয়া বলিল,—আমাদের পাশের বাড়ীতে একবার এক ভাড়াটে এসে আট দশমাস ছিল; তাদের শক্তিধর বলে' একটা ছেলে ছিল—তাকে তোমার মনে পড়ে, দাদা ?

—পড়ে। বড় দুর্দ্দান্ত ছিল ছেলেটা। তার কথা হঠাৎ তোমার মনে পড়ে' গেল কেন ?

—এই এঁকে দেখে। দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য্য মিল… ভুরু থেকে চিবুক পর্য্যন্ত অবিকল এক রকম।

—তোমার এতও মনে থাকে; তখন ত' তুমি আট নয় বছরের।

—তার কারণ আছে।…অত মা'র আমি কারু কাছে খাইনি…পদার্পণ করেই সে একদণ্ডেই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য করে' নিয়েছিল বেশ মনে পড়ে; আর তার তেজের তারিফ মনে মনে এখনো আমি করি।

—সে-ও হতে পারে, বৃহত্তর সংস্করণ।

—না, সে নয়। নাম বল্‌লে সিদ্ধার্থ বসু; আর তার ভুরুর কোণে কাটার একটা দাগ ছিল, এঁর তা' নেই; সন্দেহ হ'তেই আমি সেটা লক্ষ্য ক'রেছি।

চায়ের সঙ্গে অজয়ার গানের কথা রজতের মনেই রহিল না… বাহিরে অকাতর ভাব দেখাইলেও, ভিতরে তার দুর্দ্দশার অবধি ছিল না।…মৃত্যুমুখে সত্যই সে পতিত হইত কি না বলা যায় না; কিন্তু তার চরম ত্রাস আর অশেষ বিভীষিকা তার অন্তর-পুরুষটিকে বহুক্ষণ মুহুর্মুহুঃ ঝাঁকি দিয়া দিয়া একেবারে শীর্ণ ধরাশায়ী করিয়া রাখিয়া গেছে।—

নিঃশব্দে চা শেষ করিয়া রজত উঠিয়া পড়িল; বলিল,—শরীর আর মনটা বড্ড ঝাঁকানি খেয়েছে; বিশ্রাম করিগে।…

সিদ্ধার্থ তার লাঠিখানা হঠাৎ ফেলিয়া গিয়াছিল; ননী সেটা

দুইহাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিল,—যেমন বাহার তেম্‌নি বহর। সৌখীন বটে।...আধ মণের কম নয়।...সিদ্ধার্থ বসু।

অজয়া বলিল,—কোথায় ?

—তিনি বোধ হয় অন্ধকারে লুপ্ত হ'য়ে গেছেন এতক্ষণ...আমি বল্‌ছি নামের কথা—এই লাঠির মাথায় রূপোর গায়ে লেখা রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ননী হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—উঃ কি চেহারা, যেন দ্বিতীয় বৃকোদর। চোখ দু'টো দেখেছ, দিদিমণি, যেন জ্বল্‌ছিল।—

—জ্বল্‌ছিল নাকি ? তা' ত দেখিনি—বাতির মত, না কয়লার মত ?

—অন্ধকারে শিকারী বেড়ালের চোখের মত।

অজয়া রজতের পরিত্রাণের কথাটাই ভাবিতেছিল।...মিনিট-খানেক অন্যমনস্কের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ননী হাসিতে লাগিল। বলিল,—দেবারই কথা ; ঐ চোখ, তার ওপর গোঁফের গোছা—ইয়া !

কিন্তু অজয়া ধম্‌কাইয়া উঠিল,—অন্ততঃ আজকার দিনটা তাঁর উপকার স্মরণ কর্‌ ; তা' না পারিস্‌, চুপ করে থাক্‌। মানুষের চেহারা নিয়ে ইতরের মত বিদ্রূপ করিস্‌নে।

ননী ধমক্‌ খাইয়া নির্ব্বিবাদে চুপ করিয়া থাকিবার মেয়ে নয় তেম্‌নি হাসিতে হাসিতেই বলিল,—আমি ত' বিদ্রূপ করিনি,

দিদিমণি; তুমি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বল্‌লে; আমি ভুল করে' ভেবেছি, ঐ বুঝি তার কারণ। কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি—কসুর মাপ করো।

এবার অজয়াও হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—তবু হাস্‌ছিস যে?

—আমার হাসি তুমি দেখো না; আমার হাসির কোনো মানে নেই।

—আমায় একটি কথায় ভুলোতে চাস্‌নে, ননি; তোর মনের কথা আমি বুঝেছি।

—তুমি কথা ফেনাচ্ছ, দিদিমণি; সরল হাসির বড় জটিল অর্থ করছো।...কিন্তু, পুরুষের প্রতিপত্তিটা ঠিক্ বজায় আছে দেখ্‌ছি—আদিকালে যেমন ছিল।

—মানে?

—কবে কে তেজ দেখিয়েছিল, তুমি তাই মনে করে' আজ সিদ্ধার্থবাবুর দিকে ভালো করে' চাইতেই পারলে না।

—তোমার সন্দেহ অমূলক।......কি, মাণিক?

মাণিক বলিল,—খাবার দিয়েছে। দাদাবাবু নাম্‌তে বল্‌লেন।

মাণিক চলিয়া গেলে ননী বলিল,—দেখ্‌লে মাণিকের চেহারাখানা! সেই জরিমানার দিন থেকে হাসা বন্ধ করে' দিয়েছে; মদন ত' ক্রমাগত কাঁদছে।

—আর পারিনে; বলে' দিস্, এবারকার মত জরিমানা মাপ করা গেল।

(৭)

সিদ্ধার্থের রূপসন্দর্শন ঘটিয়াছে ।—

সে মানেই তার রূপ ; রূপের অসীমতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে ভাবিতেই পারা যায় না—

পৃথিবীর অন্তরভূমির স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জলধারা যেমন প্রস্রবণের আকারে নির্গত হয় তেমনি সে রূপ···যেন অকালশুষ্ক ধরিত্রীর বিস্তৃত বুকের উপর দিয়া সেই অপরিমেয় রূপের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে···জীবনের মূলে সে প্রাণময় রসাঞ্জলি—

কিন্তু সে প্রবাহের উৎস যেন তাহার ঐ দেহে নয়—

আকাশের নীল রংটা যেমন আকাশের গায়ে নয় ; গিরির ধূসর গাম্ভীর্য্য যেমন গিরির অঙ্গে নয় ; তেমনি তার রূপ যেন বহুদূর হইতে বিচ্ছুরিত একটি অপরূপ মসৃণ লাবণ্যের বর্ণ শ্রী—

অতি নিকটে, তবু অজানার গভীরতায় সে রহস্যময়···শুধু অনুভবের বস্তু ।

সিদ্ধার্থ অতিশয় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে করিতে রজতদের

সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিল ; কিন্তু পথে আসিয়াই তার আহ্লাদের অন্ত রহিল না।

...উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পা দিয়াছে—

অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ, চোখে চোখে চাহিয়া বাক্য-বিনিময় ঘটিয়াছে—

যাওয়া-আসার নিমন্ত্রণও পাইয়াছে—

এ-পর্য্যন্ত কল্পনার চরিতার্থতার কিছু বাকি নাই...

কিন্তু পরক্ষণেই খচ্ করিয়া কোথায় যেন বিঁধিল—

সে অপবিত্র।—মনে হইতেই তাহার সমগ্র চিত্ত, একাগ্রতা ভাঙিয়া, আর অগ্রসর হইতে চাহিল না।...যে মন্দিরে সে প্রবেশ করিতে চায় অশুচি অন্তর লইয়া তথায় প্রবেশ করিবার অধিকার আছে বলিয়া তার কিছুতেই মনে হইল না।...তার জন্মের উপর দেবতার আশীর্ব্বাদ, মানুষের শুভ-ইচ্ছা বর্ষিত হয় নাই—

কিন্তু সে অপরাধ তাহার নয়—

যে অপরাধ তার স্বকৃত তার ওজনও ত' কম নয় ; এবং তাহারই ভারে তাহার মন যেন কেবলই নুইয়া পড়িতে লাগিল।...

...পাপের কলঙ্ক ইচ্ছামত ঝাড়িয়া ফেলিয়া অম্লান-মুখে সুখী সাজা যায় না—প্রাণান্তকর এই কুণ্ঠাই বুঝি তাহার মত পাপীর তীব্রতম শাস্তি।

......অসংখ্যপদ সরীসৃপের মত অতীতের স্মৃতি তাহার বুকে বুকের চাপ দিয়া জড়াইয়া আছে...তার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসে শরীর অবশ হইয়া আসে—তথাপি সাধ্য নাই যে, সেটাকে টানিয়া তুলিয়া

সে আড়ালে কোথাও ফেলিয়া দেয়।—নিজের লজ্জা চিরদিন নিজেকেই বহন করিতে হইবে এই কঠিন নিয়মটাকে কোন প্রকারে উল্টাইয়া দিবার উপায় একেবারেই নাই।

একদিকে সিদ্ধার্থর শিক্ষিত মন, অন্য দিকে তার বর্ব্বরতার প্রগতি; একদিকে ভাবোন্মাদনা, অন্য দিকে বস্তুমোহ; একদিকে কি করা যায় তৎসম্বন্ধে অসাধারণ দুশ্চিন্তা, অন্য দিকে প্রয়োজনের দুর্নিবার চাহিদা—

এই সব বিপরীতধর্ম্মী প্রেরণার সঙ্কোচ ও প্রসারের মধ্যে পড়িয়া সিদ্ধার্থ অবিরাম হাঁপাইতে লাগিল······দাবিদার সকলেই—কিন্তু মানুষের ব্যবস্থাতন্ত্র তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেয় না।...

* * * *

পরদিন।

সবিনয়ে নিজের পরাজয় সহস্রবার স্বীকার করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া চলিতে চলিতে সিদ্ধার্থ যেখানে যাইয়া উঠিল, সেটা রজতের বৈঠকখানা। সিদ্ধার্থ ঘাড় তুলিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল—এখানে সে কেমন করিয়া আসিল!...তার পর দেয়ালের দিকে চাহিল—

চার দেয়ালে আটখানা ছবি—

একখানার নীচে লেখা রহিয়াছে—অঞ্জয়া ··দেখিবামাত্র নির্জ্জন ঘরের ভিতর সিদ্ধার্থর কল্পনা ছুটিতে লাগিল,—চাঁপার কলির মত অঙ্গুলিগুলি লীলায়িত হইয়া এই ছবিখানি আঁকিয়াছে, সমস্ত

কল্পনাশক্তি প্রাণপণে জাগ্রত আর সূচ্যগ্রের মত তীক্ষ্ণ হইয়া এই ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, চোখের দৃষ্টি নত হইয়া ইহার উপর ঢলিয়া পড়িয়াছিল—সেই প্রাণ কেমন মধুর, দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম, আঙুলগুলি কত কোমল!......

আরো কত তথ্য সে আবিষ্কার করিতে পারিত কে জানে; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির আগমনেই তার কল্পনার বিন্যাস হঠাৎ এলোমেলো হইয়া গেল।

যে আসিল সে ভৃত্য মাণিক।—

সাধারণ ভদ্রলোক এরূপ অবস্থায় যেরূপ আচরণ করে, মাণিককে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া সিদ্ধার্থর আচরণে সেই স্বাভাবিকতা ছাড়া আর সবই দেখা গেল...

থতমত খাইবার তার কথা নয়—

জবাবদিহিরও প্রয়োজন ছিল না—

অথচ অপরাধীর মত অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া সিদ্ধার্থ যে কি বলিতে বলিতে পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল, মাণিক তাহার চৌদ্দ আনাই বুঝিতে পারিল না।......খানিক অবাক্ হইয়া থাকিয়া সে উপরে সেই খবরটাই দিতে গেল।

(৮)

রজত ও অজয়ার পিস্‌তুত' ভাই বিমল আসিয়াছে এবং তাহার আসা লইয়া অজয়া উঠিতে বসিতে এমন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছে যে, বিমলের নাকে কান্না, অশান্তি আর অভিযোগের অন্ত নাই।

বিমল বলিতেছিল—দাদা শুনে ত' কিছু বললে না; কিন্তু তুমি শাসন কর্‌ছ যেন আমি ফেরারী আসামী।

অজয়া বলিল—পিসিমা কত ভাব্‌ছেন বল্‌ তো। হয় তো তিনি নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে' বসে' আছেন, যারা তোকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারা একে একে এসে খবর দিচ্ছে পাওয়া গেল না—তাঁর তখনকার কষ্টটা তুই ভাবছিস্‌ নি?

—ভাবছি বই কি; তবে এতক্ষণে তার ছট্‌ফটানি থেমে গেছে, টেলিগ্রাম পৌঁছে গেছে।

—এক-কাপড়ে বেরিয়ে এলি, যদি পুলিশে ধরতো?

—ধর্‌তো ধরতোই, কিন্তু রাখ্‌তে পারতো না বেশিক্ষণ।

—কেন?

—মামার নাম করলেই ছেড়ে' দিতে পথ পেত না।

—গাড়ীভাড়া কোথায় পেলি ?

—ঐটে বাদে, দিদি ; ঐ কথাটা জিজ্ঞেস্ কর' না।

—বই বেচে ?

—সে মতলবটাও যে মাথায় না এসেছিল এমন নয় ; কিন্তু সাহস হ'ল না।······গেলাম এক বন্ধুর কাছে। সে বল্‌লে, দিতে পারি যদি গিয়েই পাঠিয়ে দাও। আমি তখন পেলে বাঁচি ; তাতেই রাজি হ'য়ে টাকা নিয়ে কিছুদূর এসেই কি মনে করে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি টাকা নেই ! আমার ত' বোঁ করে মাথা ঘুরে গেল......গলির ভেতর নিশ্চয় কেউ পকেট মেরেছে !······ছুট্‌তে ছুট্‌তে গেলাম ফের যে টাকা দিয়েছিল তার কাছে ; বল্‌লে—কি হে ফিরে এলে যে ? আমি ধপ্ করে বসে পড়লাম, বল্‌লাম—টাকা, ভাই, হারিয়ে গেছে ; কে পকেট মেরেছে। বলেই কেঁদে ফেল্‌লাম।······সে বল্‌লে— টাকা তুমি নিয়েই যাওনি তা' হারাবে কি ? আমি বল্‌লাম— নিয়েই যাইনি কি রকম ? স্পষ্ট মনে আছে····· সে বল্‌লে,— না হে না। টাকা তোমার হাতে দিলাম, তুমি ফরাসের ওপর নামিয়ে রেখে' গল্প জুড়ে দিলে······তারপর 'আসি ভাই' বলে তাড়াতাড়ি উঠে' গেলে, টাকা পড়ে' রইলো। ভাবলাম, ফিরতে হবে বাছাধনকে।······তাই বসে' ভাবছি আর মনে মনে হাস্‌ছি —এমন সময় তুমি এসে হাজির।······তখন দু'জনে খুব খানিকটা হেসে নিলাম।·· ···তারপর টাকা আবার গুণে, পকেটে রেখে,

পকেটে ঠিক্ রাখ্লাম কি না দু'চারবার ভাল করে' দেখে, চলে এলাম।

বিমলের মুখচোখ নাড়া দেখিয়া অজয়ার হাসি পাইতেছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল গম্ভীরভাবেই,—তারপর?

—তারপর, তার পরদিন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়্লাম।····· তোমাকে বেশিদিন না দেখে থাকতে পারিনে যে, দিদি!

—বন্ধুর ঋণ-পরিশোধের কি হবে?

—সে দায় তোমার, আমি এসে খালাস্!

রজতের চায়ের তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে হাতের কাজ চাপা দিয়া এই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই অজয়া বলিল— শোনো, দাদা, বিমলের কথা—ও এসে খালাস্, ওর ঋণ-পরিশোধের দায় আমার।

বিমল বলিল—দাদা, তুমিই বলো, দিদিকে না দেখে যে আমি বেশিদিন থাকতে পারিনে সে কি আমার দোষ?

—না অজয়া, তোমার ঐ দোষটা তুমি অস্বীকার করতে পারছো না। কিন্তু ঋণ-পরিশোধের দায়টা কোত্থেকে এল? বলিয়া রজত আসন লইল।

—পুরণো বইয়ের দোকানে পিসেমশায়ের বই বাঁধা রেখে বিমল গাড়ীভাড়ার জোগাড় করেছে, তাই—

বিমল লাফাইয়া উঠিল—মিছে কথা, দাদা; দিদি আমায় রাগাচ্ছে। এক বন্ধুর কাছে টাকা ধার নিয়ে এসেছি; সে টাকা দিদি দেবে বলেছে।

—দেব বলেছি?

—কথায় বলনি, হেসে বলেছ। তুমি না দিলে আমি কোথায় পাবো? শেষে কি বন্ধুর কাছে চোর ব'ন্‌বো?

রজত বলিল—সেইটেই আগে ভাবা উচিত ছিল; তা' যাক্…বড় একটা কাজে তোমাদের চুক্ হ'য়ে গেছে—কেউ বোধ হয় লক্ষ্য করনি যে আজ আমি ভাল করে' চা খাইনি… একবার নিয়ে এলো—একেবারে ঠাণ্ডা; আর একবার নিয়ে এল এত মিষ্টি দিয়ে যে, ননীর সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়ের সা'র আমার পায়ের গোড়ায় এসে উপস্থিত। ননী ক্ষুণ্ণ হবে বলে খেলাম বটে, কিন্তু তৃপ্তি আদৌ পাইনি। বিমল বুঝি চা খাস্‌নি?

—ছেড়ে দিয়েছি।

—অদৃষ্ট মন্দ। যে চা খায়না সে সংসারের অর্দ্ধেক সুখে বঞ্চিত। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ্‌তে অমন জিনিস আর নেই।

—মাষ্টার মশায় বলেন চায়ের কাজ গরম দুধেই হয়।

—কিছুই হয় না। দুধ শিশু বৃদ্ধ আর রোগীর পথ্য। ননি, দিদিটি, পিঁপ্‌ড়ের সা'র ইত্যাদি বলে যে মিথ্যে গল্পটা বলেছি তা' যদি না শুনে থাকো—

ননী পাশের ঘর হইতে বলিল—শুনিনি। হ'য়ে গেছে; আন্‌ছি।

—ননি, চায়ে কি আফিঙ দিয়ে থাকো? বলিয়া রজত সম্মুখের চায়ের কাপের দিকে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যেন তাহার ভিতর আফিঙেরই সন্ধান সে করিতেছে।

ননীর বুকটা হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া উঠিল—

ভয় ত পাইবারই কথা।

আফিঙ জিনিসটার গুণাগুণের সঙ্গে ননীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই; তবে দুর্ব্বশ্য জানোয়ারকে নেশা ধরাইয়া বশীভূত করিতে আফিঙের ব্যবহার হয়, তাহা সে শুনিয়াছে; এবং যে কথাটা আরো সাংঘাতিক তাহা এই যে—আফিঙ বিষ।

ননীর ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—

বিবর্ণমুখে বলিল—সে কি! চায়ে আফিঙ—

—না, তাই বল্‌ছি। চা দেখ্‌লেই আমার চোখ অবসন্ন হ'য়ে আসে কি না, তাই......

বলিয়া রজত হাসিতে লাগিল; কিন্তু ননীর মুখ লাল হইয়া উঠিল।..সন্দেহ নাই, অত্যন্ত বুক ধড়্‌ফড়্ করিয়া ননীকে অতি অকস্মাৎ নিদারুণ একটা মানসিক পীড়া সহ্য করিতে হইয়াছে—

তাহার প্রতিক্রিয়া একেবারেই নিষ্ফলে গেল না;

"দাদাবাবুর কথাবার্ত্তা ভাল নয়"—বলিয়া সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রজত একটু অপ্রস্তুতই হইল—

কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া বেশিক্ষণ কর্ত্তব্যে অবহেলা করা তার অভ্যাস নাই; বলিল—বিমল, তোর দিদির গান কতদিন শুনিস্‌নি তা' মনে আছে?

বিমল বলিল—অনেক দিন।

—অজয়া, শুনো' বিমলের কথাটা।...ননী বুঝ্‌লে না, আমি ঠিক্ জানি, চোখ বুজ্‌লে যে কান সজাগ হয় তার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল ভগবানের রাজ্যে শক্তির একটা সামঞ্জস্য রাখা।...অজয়া, ওঠো।

অজয়া হাসিয়া বলিল—তবু ভাল, ঘুরিয়ে এনে ফেলেছ ঠিক।

—বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি যে। বলিয়া রজত গানের আশায় দেহ শ্লথ করিয়া তুলিল।

অজয়ার গান অর্দ্ধেক অগ্রসর হয় নাই—এমন সময় সিদ্ধার্থ হঠাৎ প্রবেশ করিল; কিন্তু সে ব্যতীত আর কেহ জানে না যে, এই মাত্র সে জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছে।...দরজার বাহিরেই সে দাঁড়াইয়া ছিল—অন্ধকারে; কিন্তু এত নিকটে থাকিয়াও গানের সুর বোধগম্য হওয়া দূরে থাক্, গানের একটি বর্ণও তার কর্ণে প্রবেশ করে নাই—

কেবলি পিছন ফিরিয়া সে সভয়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে, কেহ আসিয়া পড়িল কি না—

দ্বিধাগ্রস্ত মনে পা উঠিয়া উঠিয়া থামিয়া পিছাইয়া গেছে—

তারপর হঠাৎ এক সময় আসাড়-মস্তিষ্ক আচ্ছন্নের মত ভিতরে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন তাহার এই জ্ঞান-টুকু মাত্র সজীব আছে যে, সময়োপযোগী কিছু বলিতেই হইবে।—

এবং সে সুযোগ তার মিলিল।

তাহাকে দেখিয়াই অজয়ার গান থামিয়া গেল; এবং সেই বিরামে বিস্মিত হইয়া রজত চোখ খুলিয়া বলিয়া উঠিল—আসুন, আসুন।

সকলে নীরব থাকিলে সিদ্ধার্থ বোধ হয় যেমন আসিয়াছিল তেমনই পলায়ন করিত; কিন্তু, রজতের অভ্যর্থনায় নয়, শুধু তার কণ্ঠস্বর যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল, তাহারই মধ্যে সিদ্ধার্থের মন শঙ্কায় চঞ্চল বিকৃতি কাটিয়া একটা আশ্রয় পাইয়া স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইল।...বলিল—তা' আসছি, কিন্তু এসে হঠাৎ কাঁটার মত বিঁধে পড়েছি যে! আনন্দে তদ্গত হ'য়ে ছিলেন, আমি এসে তা' ভূমিসাৎ ক'রে দিয়েছি। ইস্—যেন তপোবনে ব্যাধের উৎপাত। বলিতে বলিতে সিদ্ধার্থ মূর্ত্তিমান্ অপরাধের মত যেন কুণ্ঠায় লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।—

রজত বলিল—আপনার অনুমান দু'টিই অমূলক। আনন্দে ছিলাম বটে, কিন্তু আপনাকে দেখে তার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।

যদি অনুমতি করেন ত' নিমন্ত্রণ করি—আপনিও তপোবনের একজন অধিবাসী হ'য়ে বসুন।

সিদ্ধার্থ মাথা নাড়িতে লাগিল—আর হয় না; যে শান্তি ভেঙে দিয়েছি তাকে আবার তেমনি করে গড়ে' তোলা কঠিন হবে।—বলিয়া সে এম্‌নি ম্লান হইয়া বসিয়া রহিল—যেন শান্তিভঙ্গের দরুণ তার জরিমানা কি জেল হইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। তারপরই সিদ্ধার্থ বলিল—এ বালকটি কে?

—আমাদের পিস্‌তুত' ভাই, নাম বিমল; বাড়ীতে না বলে' চলে' এসেছে; দিদির বড় ভক্ত—দিদিকে না দেখে' থাক্‌তে পারে না নাকি!

…ইহাতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব কাহারো নাই—যে না দেখিয়া থাকিতে পারে না তাহারও নাই, যাহাকে না দেখিয়া আর একজন থাকিতে পারে না তাহারও নাই; তবু ইহার কোথায় যেন একটু লজ্জা আছে—

বিমল হাসিয়া মুখ ফিরাইয়াছিল—

অজয়া চোখ নত করিয়াছিল, কিন্তু চোখ তুলিয়া সে দেখিল, সিদ্ধার্থর মুখমণ্ডল অসাধারণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; বিমলের দিকে চাহিয়া সে বলিতেছে—উপভোগ্য জিনিস! ভক্তির টানে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা…খাসা! এস ত ভাই, হাতের ভেতর, তোমার হাতখানা একটিবার অনুভব করে' নিই। বলিয়া অতিশয় মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে হাত বাড়াইয়া দিল।

বিমল লজ্জিত মুখে অগ্রসর হইয়া গেল—

সিদ্ধার্থ দুই হাতের মুষ্টির মধ্যে বিমলের হাত জড়ো করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল—দিদির চেয়েও বড় মা…সাতকোটি সন্তানের যিনি জননী। দিদির টানে এক ঘর ছেড়ে এসে আর এক ঘরে ঢুকেছ…কিন্তু মায়ের টানে জীবনভোর যে পথে পথে বেড়াতে হবে। পারবে ত'?

বিমল বলিল—আপনার কথা আমি বুঝ্‌তে পারছিনে।

সিদ্ধার্থ একটু হাসিল; বলিল—নিজের মন বোঝোনি'। …সে কি আকর্ষণ।…উপড়ে' তুলে উড়িয়ে নিয়ে কোথায় ফেল্‌বে, পড়্‌বার আগে তা' কেউ জান্‌তে পারে না। বলিয়া সিদ্ধার্থ বিমলের হাত ছাড়িয়া দিয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল যেন তার আনত দৃষ্টি পৃথিবীর স্থূল-পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া গেছে এবং কোথায় গেছে তাহা তার জানা নাই।

রজত মনে মনে হাসিয়া বলিল,—সিদ্ধার্থবাবু, আপনি বুঝি বিরক্ত-সন্ন্যাসী?

প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধার্থ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—বিদায় চাইছি। আজকার মত আসি…

এবং কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ইজমালি একটা নমস্কার করিয়া সে চট্‌পট্‌ বাহির হইয়া গেল।

বিরক্ত-সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, আর তার লক্ষণ কি—

এবং তাহার বিপরীত আসক্ত-সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিবার উপায় এখন নাই—

কাজেই রজতের মনে হইল, লোকটার মাথার স্ক্রু কোথাও ঢিলে আছে···এত বিরাগ আর আবেগ অবিকৃত মস্তিষ্কে দেখা যায় না।

কিন্তু অজয়ার মনে হইল, সাতকোটি সন্তানের যিনি জননী তিনিই সিদ্ধার্থবাবুকে গৃহত্যাগী করিয়াছেন; জননীর ভাষাতীত আহ্বান, আর তাঁরি দেওয়া নিঃশব্দ গভীর বেদনা তাঁহাকে মুহূর্ত্তমাত্র সুস্থির হইতে দিতেছে না।···ভাবিতে ভাবিতে অজয়া একটু সহানুভূতি অনুভব করিল।

রজত বলিল,—অজয়া, বুঝ্‌লে কিছু?

অজয়া কথা কহিল না—

সিদ্ধার্থর সর্ব্বাঙ্গের মূর্ত্তিটা সে স্মরণ করিতেছিল···সিদ্ধার্থর চিন্তাস্রোতটাও যেন সম-অনুভূতির সূত্র ধরিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল······

বিমল বলিল,—আমার ভয় করছিল, দাদা, তার গোল গোল চাউনি দেখে, আর কথা শুনে'···মনে হচ্ছিল, যেন আমায় হিড়্‌ হিড়্‌ করে' টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে'।

—তা' জানিনে; তবে ভদ্রতা করে' বাড়িয়ে বলেনি; আজকার চা'টা সত্যিই মাটি করে' দিয়ে গেল। হচ্ছিল গান —নিয়ে এল তার মধ্যে কে উড়্‌তে পারে, আর—

কিন্তু রজতকে থামিতে হইল—

অজয়া তাহার কথায় রাগ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে

দেখিয়া সে বলিল,—রাগ করে' যেতে হবে না; আমি শপথ করছি পরনিন্দা আর কখনো করব না।

তার পর মনে মনে বলিল,—তোমার সাম্‌নে।

অঙ্গয়া বলিল,—কতবার এই শপথ করেছ তা' বোধ হয় তোমার মনেও নেই। তা থাক্‌ আর না থাক্‌, এখন ওঠো; মাণিক এসে একবার উঁকি মেরে গেছে।

(৯)

অজয়াকে নাম ধরিয়া ডাকিতে সিদ্ধার্থের একটা অসম্বরণীয় লোলুপতা আসিয়াছে। তার মনে হয়, নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার জীবনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া নূতন জগতের সুপ্রসন্ন উদার শ্রীক্ষেত্রে সে মহোল্লাসে ভূমিষ্ঠ হইবে।...মনে মনে অনুক্ষণ নামটি জপ করিয়া সিদ্ধার্থ তার সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রী আর প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুকে পিপাসাতুর করিয়া তুলিয়াছে।—

কিন্তু সে-দিনের দেরী আছে।...

সিদ্ধার্থ বলিতেছিল,—অতি সুন্দর! প্রকৃতির প্রকৃত মুখচ্ছবি...বিস্তৃত প্রান্তর...ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রসারিত হ'য়ে দৃষ্টি যেখানে হারিয়ে যায়, সেইখানে মেঘের গায়ে শেষ হয়েছে; গাছ-গুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হ'য়ে বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র হ'য়ে গেছে...তাদের মাথায় মাথায় পল্লবের মুকুট; এত দূরে—বিন্দুটির মত, তবু কেমন স্পষ্ট, আকাশ যেন গতিশীল হ'য়ে ব'য়ে চলেছে...সচল মেঘ, তার কোলে সচল একটি পাখীর ঝাঁক। বলিয়া ছবিখানার দিকে অতিশয় উৎফুল্ল দৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া থাকিয়া সিদ্ধার্থ পুনরায় বলিল—অতুলনীয়! বিমলবাবুর কি মত?

দিদির আঁকা ছবির প্রশংসায় বিমল গর্ব্বে গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছিল; বলিল—দিদির কোন কাজই অসুন্দর নয়। জানেন না বুঝি—দিদি যে প্রাইজ-হোল্ডার; ছবি এঁকে প্রাইজ পেয়েছে। সে ছবিখানা কোথাকার এক মহারাজা কিনে নিতে চেয়েছিল কত টাকা দিয়ে যেন, দিদি?

অজয়া বলিল—মনে নেই, তুই থাম্‌। বলিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া সে তৃপ্তিভরে হাসিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—না না, বল্‌তে দিন। মনের ভক্তিকে বাধা দিলে মানুষের বড় হানি করা হয়। তারপর কি হ'ল, বিমলবাবু?

—কি আর হবে? আমরা দিলাম না!

কিন্তু সিদ্ধার্থের বড় গোল বাধিয়া গেল—সে সেই মহারাজার স্পর্দ্ধার দিকেই চোখ্‌ রাঙাইবে, কি এদের নির্লোভ আত্ম-সম্মানের তারিফ করিবে, কি অজয়ার পুরস্কার লাভে আনন্দ করিবে—সঙ্গে সঙ্গেই তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যখন বিমলের তেড়ী কাটার নিন্দা করিতে যাইবে, এমন সময় সুন্দর একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল; বলিল—আপনি নিজেই ভাবের একটা স্ফূর্ত্তি, তাই ভাবকে অনায়াসেই মূর্ত্তি দিয়ে সামনে এনে দাঁড় করাতে পারেন…আজকালকার ছবিতে কেবল পরের মস্তিষ্কের ছন্দোময়ী ভাবকে নির্জ্জীব একটা আকার দে'য়া হচ্ছে।—বলিয়া সিদ্ধার্থ চিত্র-শিল্পের অধোগতিতে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

অজয়ার কিছু বলিবার ছিল না।

সিদ্ধার্থই প্রশ্ন করিল,—আপনার সে ছবিখানার পরিকল্পনা কি?

—ঈর্ষা আর লোভ। নির্ব্বিকার ভোগ আর অনাবিল সুখ-শান্তির মাঝখানে এরা দু'টিই স্ফীত হ'য়ে আছে···এদেরই আত্মপ্রসার দুর্ব্বার হ'য়ে মানুষকে রসাতলের দিকে টেনে নামাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ বলিল,—বাঃ।

—কিন্তু দাদা বলে—

হঠাৎ অকথিত কথারই প্রতিবাদ আসিয়া পড়িল।

রজত প্রবেশ করিয়া বলিল,—দাদা কি বলে? তোমার ছবি অতি যাচ্ছেতাই—অপ্রকৃতিস্থ মনের নির্ব্বাক্ প্রলাপ, নিষ্কর্ম্মা বৃদ্ধার অসমাপ্ত কাঁথা···এইসব বলে?

অজয়া হাসিল,—না, ঠিক তা' বলে না।

—তবে?

—রজতবাবু যা-ই বলুন, সেটা ওঁর মনের আসল কথা নয়। বলিয়া সিদ্ধার্থ একটা আপোষের চেষ্টা করিল।

কিন্তু রজত বলিল,—অর্থাৎ অসদুদ্দেশ্যহীন অসত্য। কিন্তু অসত্যকে সদুদ্দেশ্যের অলঙ্কার পরালেই সে নির্দ্দোষ হয় না। তবে আসল কথা এই যে, আমার মন্তব্যের কোন মূল্য নেই।

—যদি মূল্য থাকে তবে?

—তবে ধরে' নিতে পারো যে, তোমার ছবি বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল নয়, অসুস্থ—ভাল কথা, তোমার একটি ছেলে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, চিঠি এসেছে।

হঠাৎ একটা ধাঁধাঁ লাগিয়া সিদ্ধার্থ স্পষ্টই চম্‌কিয়া উঠিল,—কার ছেলে ?

—অজয়ার। ছেলে কি একটি দু'টি! আটগণ্ডার কাছাকাছি।

ছেলের সংখ্যা শুনিয়া সিদ্ধার্থের "ধড়ে প্রাণ" আসিলেও অন্য দিক্ দিয়া একটা অশান্তির উদয় হইল।...তাহার ঐ চম্‌কিয়া ওঠার আর ব্যগ্র প্রশ্নটার একটা অর্থ উহারা নিশ্চয়ই করিয়া লইয়াছে—

সে অর্থটা কি !...

অজয়ার ছেলে আছে শুনিয়া যে আঁতকাইয়া ওঠে সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা দাবী-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে, ইহা বুঝিয়া ফেলা ত' কাহারো পক্ষেই অসম্ভব নহে।...তাহার তরফের উদ্দেশ্যটা যদি একেবারে সোজা যাইয়া উহাদের সম্মুখে সত্যই দাঁড়াইয়া থাকে, তবে আজ হইতে এই আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বৃথা।...নিজেকে সে ধিক্কার দিল—মনের উপর যার এতটুকু আধিপত্য নাই, তার ষড়যন্ত্রের মধ্যে যাওয়া ক্ষ্যাপামি।... সিদ্ধার্থ রজতের দিকে চাহিয়া নিজেকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল।...

অজয়া বলিল,—কি অসুখ? কোনটির?

—যার নাম রেখেছিলে দুঃখু, তারি; সামান্য অসুখ, সর্দ্দিজ্বর। তোমার জন্যে বড় উতলা হয়েছে। বলিয়া রজত সিদ্ধার্থর দিকে ফিরিল, বলিল,—আপনি হয় তো ভাবছেন, এরা বলে কি!... অজয়ার অনেকগুলি পালিত পুত্রকন্যা আছে। রাস্তা থেকে অনাথ ছেলে মেয়ে কুড়িয়ে এনে—তা' সে যে জাতেরই হোক্, যে ভাবেই তাদের জন্ম হ'য়ে থাক্—কুড়িয়ে এনে, এক ডিপো করেছে, সেখানে নিয়ে তুলবে। ছ'মাসেই ছাব্বিশ সাতাশটি সংগ্রহ হয়েছে। বলিয়া রজত নিজেও অতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিল।—

কিন্তু সকলের চেয়ে সুবিধা হইয়া গেল সিদ্ধার্থর—এইটিই তার নিজস্ব বিভাগ।

চোখ মুখ হাত পা ভাবাবেগে বিস্ফারিত করিয়া সে বলিতে লাগিল,—আ...এইতো মায়ের জাতির কাজ—মমতা-উৎসের অর্গল খুলে দিয়ে অনাথের হাহাকারের নিবৃত্তি করে' দেয়া। ...আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে খুসী হ'য়েছিলাম, আজ ধন্য হ'লাম। বলিয়া সে এমন করিয়া অজয়ার দিকে চাহিল যেন সেখান হইতেও একটা ধন্য ধন্য রবই সে আশা করিতেছে।

অজয়া মুখ নত করিয়াছিল—

সিদ্ধার্থর আশা পূর্ণ হইল না।

রজত বলিল,—আপনারও কি ঐ মত?

সিদ্ধার্থ মনে মনে বলিল,—তুমিও ধন্য হে বাক্যবাগীশ।

চল্‌বার পথ আরো বাড়িয়ে দাও।···প্রকাশ্যে বলিল,—ভিন্নমতের লোক আছে এই ত' আমার পরম দুঃখ। পতিতকে ত্যাগ না করে তাকে তুলে আনার চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে জানিনে ···আমরা আত্মাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করি, কিন্তু কাজে বাহিরের অশুচির বিরুদ্ধে আমাদের দেহের সতর্কতার সীমা নাই; যেন—

—কিন্তু তাই বলে' চোর চামার জারজ!

একটি পলকের জন্য সিদ্ধার্থর মন যেন দিশেহারা হইয়া গেল; পরক্ষণেই, রজতের কথাটা যেন কানে যায় নাই, এমনি ভাবে সে বলিতে লাগিল,—নিজের সামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য—এইটি মনে করিয়ে দিয়ে যাদের আমরা উঠতে দিই না, উঠতে চেষ্টা কর্‌লে ধর্ম্মের রব তুলে যাদের মাথার উপর দেবতার নামে লাঠি উদ্যত করি, তাদের প্রশান্ত বাহ্য অবয়বের নীচে কতবড় একটা বিক্ষোভ অহর্নিশি আলোড়িত হ'চ্ছে তা' বুঝি আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারিনে।···বলিয়া সিদ্ধার্থ একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল,—তাদের ধমনীতে জল না রক্ত বইছে?

এবং নিজেই তার উত্তর দিল,—রক্তই বইছে; আর সে-রক্ত ফুটছে।...ধর্ম্মের গ্লানির ভয়ে কল্পিত বড়'র পা চিরদিন তারা কণ্ঠের উপর রাখ্‌বে না। বলিয়া সিদ্ধার্থ অনাগত সেই নিষ্মুক্তির আনন্দে ঐখানে বসিয়াই বিভোর হইয়া গেল!

রজত বলিল,—কি কর্‌বে?

—"তোমার মাথা চিবিয়ে খাব।"—কিন্তু এটা সিদ্ধার্থর মন যা' বলিল তা-ই; মুখে সে বলিল,—ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠবে—তার আয়োজন সুরু হ'য়ে গেছে…তা' না পারে সর্ব্বশুদ্ধ রসাতলে নামিয়ে নেবে।…বসুধার সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে অস্পৃশ্য বলে' যে পাশের বাড়ীর ছায়া মাড়ায় না, তার যে দুর্গতি অনিবার্য্য তাই ঘটবে…ভগ্নাংশ তার ঘটেই গেছে।…বিপদে বসুধা মুখ ফিরিয়ে থাকবে, ডাকতে হবে অস্পৃশ্যকে; কিন্তু চরম বিপদ দুয়ারে, বসুধাও টিপে' টিপে' হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে—তবু আমাদের মনে পড়ছে না যে বিপদবারণ পাশের বাড়ীতে।… ভগবান আমাদের নিজেকে দিয়ে যেদিন নিজেকে চূড়ান্ত অপমান করাবেন সেই দিনটাকে আমি প্রাণপণে ডাকছি। বলিয়া সিদ্ধার্থ একবার চোখ বুজিল…যেন ভগবানকে ডাকিবার এটাও একটা অবসর।

রজত বলিল,—অজয়াও আপনার মত বিপ্লববাদী। সে বলে, দেশের যারা যথার্থ শক্তি, যথার্থ মর্ম্ম, আমরা চাষের ভুঁই, বাসের বাড়ী থেকে পূজার মন্দির পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্ব অধিকারে বঞ্চিত করে' তাদের এমন কোণঠাসা করে' রেখেছি যে—

—তাদের মানসিক মৃত্যু ঘটেছে।—বলিয়া রজতের মুখের কথা যেন থাবা মারিয়া কাড়িয়া লইয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল,—কোনো ব্যষ্টি কি সমষ্টিকে এমন অধিকার দেয়া যেতে পারে না, যার বলে সে অপরের মানসিক মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করতে পারে। যে শাসনের যথেচ্ছাচারিতা মানুষের আত্মার সর্ব্বনাশ করে, তার

মূলোচ্ছেদ যত শীঘ্র ঘটে ততই মঙ্গল।...উনি ঠিক্ বলেন। বলিয়া সিদ্ধার্থ চোখ বড় করিয়া অজয়ার দিকে চাহিল—

দেখিল, অজয়ার মুখ প্রজ্ঞায় সংযমে যেমন গম্ভীর ঠিক্ তেমনই আছে, কেবল গাম্ভীর্য্যের উপর অতুল শ্রীসম্পন্ন একটি দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিদ্ধার্থ "শ্রম সার্থক জ্ঞান" করিল।......

আসরের গরম কাটিয়া যায় অথচ কেহ কিছু বলে না দেখিয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল,—ভগবান জাত দেখেন না, দেখেন মানুষের মনটি, তার সূক্ষ্ম গতিটি, তার নিগূঢ়তম অনাসক্তি।... আমরা অকারণে বিস্মিত হ'য়ে যাই—যখন দেখি, ঘৃণ্যতম পতিতাও এক নিমেষে ভগবানের কৃপা লাভ করে। আমাদের কাজ যেমন স্থূল আর ইতর, মনটাও তেমনি নিশ্চল আর মলিন .. ভগবান তাই তাঁর দৃষ্টি আমাদের ওপর থেকে তুলে নিয়েছেন।

রজত বলিল,—অনেকেই ত' আজকাল অনাবশ্যক সংস্কারের প্রতিকূলে দাঁড়িয়েছে; বল্‌তে সুরু করেছে, সবাই স্বাধীন চিন্তার অধিকারী; ধর্ম্মের ক্ষেত্র তোমার আমার সকলের; অন্ধ অনুকরণের মত অন্ধঅনুসরণও বিপজ্জনক; যুক্তিই গণ্য; ধর্ম্ম বাহ্যিক অনুষ্ঠানেই নিবদ্ধ নহে—তার প্রাণ আরো গভীর স্থানে; কাজেই অনুষ্ঠানের বাহুল্য বর্জ্জন করে' ধর্ম্মের যে মূল শক্তি তাকেই প্রসারিত করো ইত্যাদি। ছুঁৎমার্গ পরিহার ত' হ'য়ে এল বলে'।

—শুধু মত প্রচার করছে, কাজে কেউ করছে না।...আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে কেবল—(অজয়ার প্রতি) আপনাকে দেখলাম।

ঋষির তপোসিদ্ধি আর সত্যানুভূতির চেয়েও আপনার কাজ বরণীয়।...লজ্জিত হবেন না, মিথ্যা স্তুতিবাদ করছিনে। বলিয়া নিজেই যেন একটু লজ্জিত হইয়া সিদ্ধার্থ মুখ ফিরাইল।

তার কারণ আছে।—

স্তুতিবাদ নহে বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও কথাগুলির একটা পিঠ যেমন মার্জ্জিত ঝক্‌ঝকে, উল্টা পিঠটা তেমনি কলঙ্কিত ...মলিন দিক্‌টা রহিয়াছে কেবল তাহারি গোচরে—

কথাগুলির পবিষ্কার অর্থ সে করিতে পারে—

যে প্রয়োজনে সে-গুলিকে সে লাগাইতে বসিয়াছে তাহার অর্থও পরিষ্কার—

কেবল পরিষ্কার নহে সে নিজে।...নিজেরই দূষিত নিঃশ্বাসে মলিন দিকটা তাহার চোখের সম্মুখেই ছিল...স্তুতিবাদের কথাটায় যেন এক ঝলক্‌ অতিরিক্ত ফুৎকার পাইয়া তাহা চতুর্গুণ কালো হইয়া উঠিল।—

অজয়া বলিল,—ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হিসাবে আমি সে-কাজ করিনি, অনুগ্রহ হিসাবেই করেছি, কিন্তু আপনি তার যে অর্থ করেছেন—

—তা' কষ্টকল্পনা নয়। আপনি নিজের অজ্ঞাতসারেই এই হতভাগ্য দেশের বড় ব্যথার স্থানটিতে প্রলেপ দিচ্ছেন।... চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া সিদ্ধার্থ বলিতে লাগিল,— একটি মানুষকে পথঃ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে শিক্ষিত ভদ্র করে তুললে দেশের যথার্থ জনসংখ্যা আর চরিত্রবল বাড়ে।...অস্পৃশ্য

বলে কেউ ঘৃণা না করলে বোঝা যায় না, সেই ঘৃণার আঘাত কত বড় আঘাত। বুঝছি—বাইরে থেকে সে আঘাত হাতুড়ির ঘায়ের মত বুকে এসে পড়ছে, আর্ত্তনাদ করছি; আবার নিজেরই ঘরের লোকের বুকে সেই আঘাতই করতে আমাদের বাধছে না।...

অজয়া এই সময় হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—

কি কারণে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল কে জানে। কিন্তু তাহাকে নিজের অনুকূলে টানিয়া লইয়া সিদ্ধার্থ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; বলিল,—আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাসটি শুধু ফুস্‌ফুসের বায়ু নয়—বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথার ইতিহাস।—(রজতের প্রতি)—আপনারা অর্থশালী; অর্থের সাহায্যে যতটুকু কাজ হওয়া সম্ভব—

ধনস্থানে স্পর্শ সহে না, জানিয়া শুনিয়াও কি উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থ অর্থশালীর অর্থ সাহায্যের কথাটা বলিয়াছিল তাহা নিজেই সে জানে না—

বোধ হয় আবেগে—

কিন্তু তাহাকে থামিয়া ঢোক গিলিতে হইল।

অর্থশালীর অর্থসাহায্যে কতটুকু কাজ হওয়া সম্ভব তাহা তখনকার মত অনির্দ্দিষ্টই রহিয়া গেল—

রজত গা-মোড়া দিয়া তুড়ি বাজাইয়া হাই তুলিয়া বলিল,—হরি, হরি।

সিদ্ধার্থ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

সকৌতুকে বলিল,—রজতবাবু হাই তুল্‌ছেন, মানে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। চা খান্, আমি আসি।

কিন্তু যথার্থ বিরক্ত হইয়াছিল অজয়া। সিদ্ধার্থর উচ্চারিত কথাগুলি তার মন্দ লাগিতেছিল না—

নূতন নয়, কিন্তু বেশ পরিপুষ্ট কথাগুলি ; কণ্ঠ সবল—

দু'টিতে মিলিয়া তাহার সম্মুখে যেন একটা মনের আশ্রয়ভূমি প্রসারিত করিয়া দিতেছিল...

তার উপর হাই তোলাটাও ঠিক্ সময়োচিত হয় নাই।

অজয়াও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—যাবেন না, বসুন ; চা না খান্, সরবৎ করে দিচ্ছি।

শুনিয়া সিদ্ধার্থ একটু হাসিল—বড় করুণ হাসি। বলিল—বড়ই লজ্জা বোধ কর্‌ছি, আপনার অনুরোধ রাখ্‌তে পারলাম না। আমার রূঢ় ব্যবহার মার্জ্জনা করুন। বলিয়া উভয়কে সে নমস্কার করিল ; এবং অজয়ার নির্ব্বন্ধ-অনুরোধের মধ্যে যে সুধারস ছিল তাহাতেই অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া সে প্রস্থান করিল।

সিদ্ধার্থর পায়ের শব্দ সিঁড়ির শেষে শেষ হইল।

রজত বলিল,—বক্তা ভাল, বক্তৃতার বিষয় ভাল, বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী, বলবার ভঙ্গীও চমৎকার, কিন্তু একটা জিনিষ আমার ভাল লাগ্‌ল না।

সিদ্ধার্থর পায়ের শব্দ শুনিতে শুনিতে অজয়া একটা বেদনা অনুভব করিতেছিল—

চায়ের তৃষ্ণা তখন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছে; সে চাপা দিয়া দিল,—ননী, সে পরে হবে। অজয়া, দিদি, আমার কিন্তু কোনো অপরাধ নেই।

—নেই তা জানি।

তারপর মুহূর্ত্তেক নিঃশব্দ থাকিয়া অজয়া বলিয়া উঠিল,—কোনো দেবতা যদি দয়া করে' বর দিতে আসেন তা হ'লে আমি কি বর চাই জানো, দাদা?

—না, তা' জানিনে, তবে চায়ের মাথায় বজ্র পড়ুক বলে,—

—এ-ই চাই, তুমি যেমন আমার দাদা তেম্‌নি দাদা যেন সবারই হয়, আর সেই দাদাকে যেন কোনোদিন অসহায় করে' ছেড়ে' যেতে না হয়।

—দেবতা তেত্রিশ কোটি হলেও তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে মনে হয়; মানুষকে বর দেবার কাজ কারো আছে ব'লে নরলোকে জানা নেই; সেদিকে তাঁদের কাউকে টান্‌তে হলে বিস্তর তপস্যার দরকার। তোমার সে সম্বল—হঠাৎ ছেড়ে' যাবার দ্ব্যর্থক কথাটা কেন বল্‌লে, অজয়া? ছেড়ে যাবে কোথায়?

—কোথাও না। চোখ বুজে গান শোনো। বলিয়া অজয়া উঠিল।

(৯০)

—বিমল, কোথায় কোথায় বেড়াস্ তুই? খুব দূরে দূরে যাস্, না ভয়ে ভয়ে বাড়ীর কাছাকাছি ঘুরিস্ ফিরিস্?

—কাছাকাছি বেড়াব আমি? দিগ্বিদিকে ঘুরে আসি—রাস্তাঘাট সব নখদর্পণে। বলিয়া বিমল চক্রাকারে হাত ঘুরাইয়া দিক্ এবং বিদিকের বিস্তীর্ণতা দেখাইয়া দিল।

—সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না? বলিয়াই অজয়া ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সিদ্ধার্থ কয়েকদিন আসে না—তাই অজয়ার এই তল্লাস, কিন্তু তার নির্ব্বিকার সকৌতুক প্রশ্নের স্বরটা নিজেরই কানে যাইয়া তাহার মনে হইল, তল্লাসে যেন উদ্বেগ সুপ্রকট উৎকীর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে।...পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার মনে সিদ্ধার্থর সম্বন্ধে আদৌ উদ্বেগ ছিল কি না সহসা তাহা সে মনে করিতে পারিল না; কিন্তু প্রশ্নটা করিয়া এই যে সে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে--এই দৃষ্টিও যেন অনুকূল উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ!...
অজয়া অনুভব করিল, তার এই দৃষ্টি আর যাই হোক্, স্বাভাবিক কিছুতেই নয়।...

বিমল বলিল,—কই, না ; আর দেখা হলেই বা কে কাকে চেনে !

শুনিয়া অজয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিমলকে যাচ্ছেতাই ভৎর্সনা করিয়া ছাড়িয়া দিল ; বলিল,—লেখাপড়া শিখে বুঝি তোমার এই জ্ঞান হচ্ছে, মানুষকে তুচ্ছ কর্‌তে শিখ্‌ছ !···তিনি তোর দাদার বয়সী—দেখা হ'লে নমস্কার কর্‌বি, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা কর্‌বি—

ননী আসিয়া দাঁড়াইল—

বলিল—কাকে ?

অজয়া বলিল,—যাকেই হোক্। বয়সে যিনি বড় তাঁকে শ্রদ্ধা কর্‌তে হবে এই শিষ্টাচারটাও অতবড় ছেলেকে শেখাতে হ'চ্ছে এই আশ্চর্য্য।

বিমল পলায়ন করিল—

কিন্তু তাহার পালা হাতে নিল ননী ; বলিল,—অনুমানে বুঝেছি ব্যাপারটা।...নির্ব্বান্ধব বিদেশে একটা বন্ধু জুটেছিল,—এম্‌নি হাড়-মোটা বলিষ্ঠ চেহারা যে দেখ্‌লে সাহস জন্মে ; মনে হয়, বিপদে আপদে তার ওপর নির্ভর কর্‌লে সে বুক দিয়ে বাঁচাবে। তাকেও তোমরা ষড়যন্ত্র ক'রে তাড়ালে। এখন বিমলকে—

অজয়া অবাক্ হইয়া গেল ; বলিল,—আমরা তাড়ালাম কি রে ?

—তা বৈ কি !

ভদ্রলোককে কার্য্যোদ্ধারের গরুর মত মনে করলে সে সেখানে আর দাঁড়ায়? দাবা খেল্‌তে হবে—আসুন, সিদ্ধার্থবাবু; পাহাড়ে উঠে ফুল তুল্‌তে হবে—এগোন্‌, সিদ্ধার্থবাবু; ঝরণার জলে নাইতে হবে—আগ্‌লে থাকুন, সিদ্ধার্থবাবু।…তারপর সেদিন তাঁর মুখের ওপর হাই তুলে তাঁর কথা বন্ধ ক'রে দিয়ে চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে দিলে!…রাগ ক'রো না, দিদিমণি, আমরা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি নি। বলিয়া সে অজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল…

মুখখানা কি কারণে কে জানে বড় বিষণ্ণ দেখাইতেছিল।

সিদ্ধার্থ তখন কাছাকাছি কোথাও ছিল না—

ননীর কথাগুলি সে শুনিতে পাইল না।

কিন্তু শুনিতে পাইলে সে যে কি করিত তাহা নিঃশেষ করিয়া অনুমান করাও যায় না।—

অজয়া বলিল,—তাঁর অসুখও ত' করতে পারে।

—সেই জন্যেই আমাদের আরো উচিত, যে ক'রে হোক্‌ তাঁর একবার খোঁজ নে'য়া।

—কাকে দিয়ে নিই বল্‌ত? কোথায় থাকেন তিনি তাই-বা কে জানে! আমার ভয় হচ্ছে, ননি, তাঁর অসুখই করেছে; বিদেশে—

বলিতে বলিতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া তার মুখের শব্দ থামিয়া গেল বটে, কিন্তু কথায় কথায় যে উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তার চোখ মুখ দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল তাহার

কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না।...সেইদিকে চাহিয়া কৌতুকের বিস্তৃত হাসিতে ননীর মুখ ভরিয়া উঠিল।

রজত হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তার পশ্চাতেই যে ব্যক্তিকে দেখা গেল, সে-ই অজয়া-ননীর আলোচনাধীন সিদ্ধার্থ।

ননীর সম্মুখে উৎকণ্ঠা যে কি অর্থ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, অজয়া এতক্ষণ তাহা ঘুণাক্ষরেও অনুভব করিতে পারে নাই—

কিন্তু সিদ্ধার্থকে দেখিয়াই তার সম্বিৎ ফিরিল।

অজয়া চোখ নত করিল।

রজত লক্ষ্যও করিল না যে, অজয়ার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; নিজের আবেগেই সে বলিতে লাগিল,—সিদ্ধার্থ-বাবুর সঙ্গে রীতিমত মল্লযুদ্ধ করে' তাঁকে পরাস্ত করে' বন্দী করে' নিয়ে এলাম।...কতই যেন কাজে ব্যস্ত এম্‌নি ভাবে হন্‌ হন্‌ করে' ছুট্‌ছিলেন; আমাদের ওপরের দিকে চোখ তুলে' নামিয়ে আনতেই আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে গেল; তারপর তাঁকে ওপরে তুল্‌তে আমাকে এম্‌নি টানাটানি করতে হয়েছে যেন পাঁকের ভেতর থেকে হাতী টেনে' তুল্‌ছি।...তুমি আমাদের বস্‌তে বল্‌লে না যে, অজয়া?

কিন্তু বসিতে বলিবার যে প্রয়োজন আছে, রজতের ক্রটি

নির্দ্দেশেও অজয়ার তাহা মনেও হইল না; যাহা মনে হইল তাহাই সে বলিয়া গেল,—কেন ধরে' আন্‌লে কাজের ক্ষতি করে'! যে যা' ভালবাসে না—

অজয়ার রাগ হইয়াছিল—কতক নিজের উপর, কতক সিদ্ধার্থর উপর।...সিদ্ধার্থর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা অনুভব করিবার হেতু ছিল বলিয়া এখন তাহার মনেই হইল না; কিন্তু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সেই উৎকণ্ঠাবোধটি ত' সত্য—অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তার নাই।... অহেতুকী যন্ত্রণা-সৃষ্টির কারণটাকে সে অমান্য করিতে কেন চাহিতেছে, তাহার কাছে তাহাও ঠিক স্পষ্ট নয়—

নিজের ভিতরকার এই অস্পষ্টতার ধোঁয়া এবং নিজেকে বুঝিতে না পারার অসহিষ্ণুতাই হঠাৎ তাহার কণ্ঠে ক্রোধের আকারে দেখা দিল; কিন্তু ক্রোধবশে আত্মবিস্মৃতির প্রান্তে আসিয়াই সে নিজের দুর্ব্বলতা এবং ভুল বুঝিতে পারিয়া থামিয়া গেল।...

রজত বলিল,—ছুটিতে আবার মানুষের কাজ কি? আট দশদিন আসেন নি কেন, রাগ করেছেন কি না জিজ্ঞাসা ক'রবো, রাগ করে' থাক্‌লে' ক্ষমা চাইব—এইসব ভেবে ধরে' নিয়ে এলাম। অন্যায় করেছি? বলিয়া সে সিদ্ধার্থর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া বসাইল।

সিদ্ধার্থর কাছে এ সবই নূতন—

সহসা উদ্ঘাটিত বিশ্বরহস্যের মত নূতন...আর কেমন মনোরম তাহা না বলিলেও চলে।

সিদ্ধার্থ নির্ব্বাক্ হইয়া রজতের আড়াল্ হইতে বিমূঢ়ের মত

চাহিয়া চাহিয়া অজয়াকেই লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু রজত তাহাকে বসাইয়া দিতেই দৃশ্য সংস্থানের পরিবর্ত্তনেই যেন তাহার মনের সুবিন্যস্ত সম্ভোগটিও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।···কোনদিকে না চাহিয়া রজতের প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল,—অন্যায় দিক্‌টা দেখা আমি ছেড়ে' দিয়েছি।—

—বেশ করেছেন। বলুন ত, এ ক'দিন আসেন নি কেন? ননি, চা।

মনে খট্‌কা লাগিয়া সিদ্ধার্থ কষ্টকর একটা কম্পন অনুভব করিতেছিল...

অজয়া তাহার দিকে চাহিয়াও দেখে নাই। খট্‌কা এই যে, কেন?···অজয়ার রাগটা সে ধরিতে পারে নাই; তাহারই কথা কহিতে কহিতে কেন সে অমন করিয়া থামিয়া গিয়াছিল তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই—

কেবল বুঝিতে পারিয়াছে, অজয়া তাহার দিকে চোখ ফিরায় নাই।

সিদ্ধার্থর দৌর্ব্বল্য সর্ব্বত্র—

সেই সর্ব্বব্যাপী দুর্ব্বলতাকে অহরহ আবৃত করিয়া আঘাতের হাত হইতে রক্ষা করিয়া চলা যেমন অসম্ভব, আঘাতের ভয়ে সে অনুক্ষণ তেমনি কাতর।···তার শশঙ্ক সতর্কতার অন্ত নাই যে, কোথায় একটু অসাবধানতা ঘটিবে—অমনি সেই ছিদ্রপথে দেহে কলি প্রবেশ করিয়া তার সকল আশা-আয়োজন পণ্ড করিয়া দিয়া তাহাকে একেবারে নিরস্ত্র নিঃসহায় করিয়া রাখিয়া যাইবে···

সর্ব্বদাই তার মনে হয়, কখন সে আনমনে গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়াইয়া দিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে স্থানচ্যুত হইয়া তার নিষ্কৃতির রন্ধ্র আর কোনোদিকেই রহিবে না।

তাই অজয়া তাহার দিকে না চাওয়ায় হঠাৎ অবলম্বনের অভাবেই তার মনে যে কত বিষাদ আর শঙ্কা জমিয়া উঠিল তাহার ইয়ত্তা নাই।...অজয়ার মনে বুঝি তাহার জন্য একটুও স্থান নাই।

রজতের প্রশ্নের জবাব তবু সে অবিলম্বেই দিল; বলিল,—ছিলাম না এখানে।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—আমাদের মণ্ডলীর কাজে।

—কোথায়?

—পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামে গিয়েছেন কখন?

—না; হ্যাঁ, গিয়েছিলাম একবার কিন্তু ফিরে এসেছিলাম কেঁদে। প্রথম রাত্রেই যেখানে মাথা রেখে' শুয়েছিলাম তারই ঠিক্ সিকি ইঞ্চি তফাতে অর্থাৎ বেড়ার ঠিক ও-পিঠেই আচম্‌কা এমন একটা বিকট আওয়াজ হ'য়ে উঠ্‌ল যে আমি ভয়ে কেঁপে, কেঁদে যাই আর কি!...

মা বল্‌তে লাগলেন, ভয় নেই, ভয় নেই—শেয়াল।...বাড়ীর সবাই মিলে, শেয়ালকে মেরে' দেব বলে' তর্জ্জন করে' আমায় সাহস দিলেন বটে, কিন্তু মা আমায় নিয়ে তার পরদিনই পালিয়ে এলেন।...শেয়ালের ডাক ছাড়া সেখানে উপলব্ধি কর্‌বার মত কি

আছে জানিনে। তবে আজকাল মশকের উৎপাতের কথা কাগজে বেরোয় দেখ্‌তে পাই।—

সিদ্ধার্থ চমৎকার একটি ভ্রূভঙ্গী করিল—

রজতের এই অজ্ঞতা যেন তাহারই উপর নির্য্যাতন!

বলিল,—মাত্র এই?···শেয়াল আর মশার উৎপাত ছাড়া সেখানকার অনেক খবর অনেকেই জানেন না। কিন্তু বিশেষ খবরটি রওনা হয়েছে—একদিন এসে সে পৌঁছবেই···তখন চম্‌কে' উঠে দেখ্‌বেন, রসাতলের তলদেশে এসে পা ঠেকেছে··· কোথাও ছিদ্র নেই, আলো নেই, অবলম্বন নেই—

—সর্ব্বনাশ, এম্‌নি দুরদৃষ্ট আমাদের হবে!

—হবে বৈ কি।

—খবরটি কবে পাবো বলে আন্দাজ করেন?

—এখনো সাবধান না হ'লে অচিরেই পাবেন।···আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি যে-অঙ্গ আশ্রয় করে' সে-ই শুকিয়ে উঠেছে··· ভেঙেচুরে পড়্‌লাম বলে'। কিন্তু ভরসার কথা—

—বাঁচা গেল। ভরসার কথাও আছে তা' হলে?

—আছে। এই জ্ঞানটা ফিরিয়ে আন্‌তে হবে যে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, পুণ্য—এর কোনোটাই হাতধরা নয়।··· আত্মদানের প্রেরণা যখন দুর্ব্বল হ'য়ে আসে তখনই অধঃপতিতের মনে হয়, পরিত্রাণ সাধনা-নিরপেক্ষ এবং সুলভ। একটু হরিনাম করে', গঙ্গায় একটি ডুব দিয়ে উঠে, হাত-পা ছুড়ে একটু আস্ফালন করেই তার মনে হয়, যথেষ্ট করা হচ্ছে। সভ্যজগৎ তাই দেখে

হাসে।···পৃথিবীকে আমাদের দেবার কিছু আছে কি না জানিনে, থাকে ত' ভালই ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য কিছু নেই। অথচ ঐ জিজ্ঞাসারই তত্ত্বটুকু সভ্যতার নিদর্শন—আগেও ছিল, এখনো আছে।

রজত কষ্টবোধ করিতেছিল ; সংক্ষেপে বলিল,—কিন্তু হচ্ছিল পল্লীর কথা।

—আমার তা' মনে আছে। পল্লীকে ভিত্তি করে' যাঁরা দেশকে তুল্‌তে চান ঐগুলি তাঁদের সম্বন্ধে। পল্লীর দিক্ দিয়ে ভরসার কথা এই যে, সে শিক্ষাপটু ; উপকার কিসে হয়, বুঝিয়ে বল্‌লে সে তা' বুঝ্‌তে পারে কিন্তু শেখাবার লোক নেই।

—অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে' তাকে বর্দ্ধিষ্ণু, বৈজ্ঞানিক করে' তোল্‌বার সহিষ্ণুতা আর অপর্য্যাপ্ত সময় মানুষের কই ?

আপনার নেই কিন্তু আমার আছে।···আর, তারা অশিক্ষিত নয়, নিরক্ষর। তাদের মধ্যে জন্মার্জ্জিত শিক্ষার একটা ধারা বইছে ; তারা সভ্য এবং সাধক।···জগতের সম্মুখে নিজস্ব প্রশ্ন নিয়ে যে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল, সে আমাদের পল্লী।···ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়েই আছে···গা তুলে' অগ্রসর হ'লে বীজ বপন করতে পাথরে লাঙল বসা'তে হবে না—অবশ্য যদি সহিষ্ণুতা আর অপর্য্যাপ্ত সময় মানুষের থাকে।···

সিদ্ধার্থর বাগ্মিতা শুনিতে শুনিতে অজয়া একটি আত্ম-নিপীড়িত তপোশীর্ণ সাধকের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতেছিল—

মূর্ত্তিটা সিদ্ধার্থর নয়, কাহারোই নয়—

তবু সে একটা মূর্ত্তি—অক্ষয়, আর তেজে গর্ব্বে এবং প্রতিষ্ঠার আনন্দে দুঃসহ চঞ্চল…

সিদ্ধার্থ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল—

অজয়া আগুনে ঘৃতাঞ্জলি নিক্ষেপ করিল; বলিল,—সময় আছে, নেই ইচ্ছা।

—ঠিক্, নেই ইচ্ছা, ব্যাপক অর্থে।…অনেকে ওজর দেখান, আমরা অসহায়; কিন্তু ইচ্ছার অভাব ছাড়া অন্য কোনো কারণই স্বীকার করা কঠিন। বড় বড় ক্ষেত্রে আমরা যতবড় অনাথই হই না কেন, নিতান্তই এই ঘরের কথাটিতে তত নিরুপায় আমরা নই। বলিয়া সিদ্ধার্থ মাথা নত করিল—যেন, অজয়ার মুখ দিয়া যে সত্যটা নির্গত হইয়াছে তাহারই সম্মুখে।

রজত বলিল,—কিন্তু একটি দু'টি লোক এতবড় বিরাট্ একটা কাজে হাত দিলে নিজেকে একা আর অসহায় মনে করা ত' স্বাভাবিক। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবারও ভয় আছে।

—কাল্পনিক ভয়। একটি পল্লীর সুখ-দুঃখ সর্ব্বসাধারণের সুখ-দুঃখ বোধে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে সে আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ কর্‌বে না—সার্থকই করবে।…আপনার কাজের মাঙ্গল্য তাকে আকর্ষণ কর্‌বে, মুগ্ধ কর্‌বে, উন্নত কর্‌বে—কারণ সে শিক্ষিত এবং সভ্য। একটুখানি এগিয়ে গেলেই দেখ্‌তে পাবেন, যাদের সাহায্য কর্‌তে এসেছেন তারাই আপনার সহায়।

রজতের দৈবাৎ মনে পড়িয়া গেল, কি একখানা গল্পের বহিতে যেন সে পড়িয়াছিল, পল্লীসমাজপতিরা বড় দুর্দ্দান্ত, চক্ষু-

লজ্জা আর কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত। বলিল,—যদি আমি কখন যাই ও-কাজে তবে বোধ হয় সমাজপতিদের অতিবুদ্ধির দৌরাত্মেই আমায় পালিয়ে আস্‌তে হবে।

—সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে যুঝ্‌তে হবে স্বীকার করি। যারা মতলব ছাড়া কথা কয় না, তারা মতলব খুঁজবেই, ঠিক অমানুষের মত। কিন্তু কর্ম্মের সম্মুখে যদি নির্ব্বোধ প্রতিকূল শক্তি না রইল তবে অসাড়তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবেন কি করে!…নেশা ধরিয়ে দেবে তারাই, যারা আপনাকে চাইবে না।

অজয়া বলিল,—কিন্তু নিজের কল্যাণের দিকে নিশ্চেষ্টতার ফলে যে কলুষ জমে' উঠেছে, কত দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় তা' দূর হবে!

সিদ্ধার্থ কৃতার্থ বোধ করিয়া অজয়ার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাই হ'য়ে যেতে পারে যদি আলস্য ত্যাগ ক'রে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়। …গতির এমন একটি নিজস্ব শক্তি আছে যা' আনন্দ দেয়। ঝড় ছোটে—মানুষ ভয় পায়; কিন্তু অনন্ত আতঙ্কের মধ্যেও অদ্ভুত একটা আনন্দের সঙ্গে সে ঝড়ের গতির দিকে চেয়ে থাকে। এই আনন্দটা দিতে পারলেই মানুষ অন্ধ হ'য়ে অনুসরণ করে; যেমন—

—আপনি কি করেন?

প্রশ্ন শুনিয়া সিদ্ধার্থ রজতের দিকে ফিরিল—

বেশ ভাবটা আসিয়াছিল…

বাধা পাইয়া তার ইচ্ছা করিতে লাগিল, রজতকে দুই হাতে চড়াইয়া দেয়।...বলিল,—যা' পারি তা' করি। বলিয়া সিদ্ধার্থ যখন পুনরায় অজয়ার দিকে চোখ ফিরাইল তখন অজয়ার চোখের সেই তীব্র দৃষ্টিবিচ্ছুরণ ক্ষান্ত হইয়া গেছে।

রজত বলিল,—সে কাজটা কি?

—নিরূপিত কাজ কিছু নেই। আর্ত্তরক্ষা, পল্লীতে পল্লীতে দেশাত্মবোধ জাগরিত করা, সংস্কারকে মোহনির্ম্মুক্ত করা—

অজয়া বলিল,—শিক্ষাবিস্তার?

—তাও করি। আমরা জানি যে, যারা নিম্নস্তরে আছে তাদের উচ্চস্তরে তুলে আনবার একমাত্র বাহন শিক্ষা। জল-চল হ'লেই কেউ স্তর পর্য্যায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না...শিক্ষায়তনেই সব একাকার হ'য়ে যাবে—জলে আর দুধে যেমন। মেশবার একটা আধার চাই; সেটা ফরাস্ নয়, শিক্ষা।

শুনিয়া অজয়া সিদ্ধার্থর মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল—যেন সিদ্ধার্থর কথাগুলির সমগ্র অর্থ অতিশয় ধীরে ধীরে সে গ্রহণ করিতেছে।—

কিন্তু রজত আজ আর হাই তুলিল না—

সেদিন সবাই তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিল। আজ সে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে চার-পাঁচবার গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিয়াও উঠিল না...তারপর এখন সঙ্গত অবসর লাভ করিয়া বলিল,—সিদ্ধার্থবাবুর কাছে আমার একটি কৃপাভিক্ষা আছে। আপনার কথা যদি শেষ হ'য়ে থাকে তবে বলি।

সিদ্ধার্থ বলিল,—কথার শেষ নেই, তবু বলুন। কিন্তু বিনয়ের বহর দেখে ভয় হচ্ছে, কাজটা হয়তো দুঃসাধ্য।

—দুঃসাধ্য হ'লে সাধ্যানুসারে চেষ্টা কর্‌বেন।

—অসাধ্য হলে?

—অস্বীকার কর্‌বেন।

—এখন কাজটা কি শুনি?

—একটি গান শোনাতে হবে।

—শোনাব। আপ্‌নাদের শেষ অনুরোধটা না রাখ্‌লে নিজের কাছেই আমরণ অপরাধী হ'য়ে থাক্‌তে হবে।—বলিয়া সিদ্ধার্থ কঠিন পরীক্ষকের মত মুখ করিয়া কোনোদিকেই চাহিল না।···

চির-বিচ্ছেদের এই ইঙ্গিতটা যতদূর নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রদান করা সম্ভব তাহা সে করিয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্যটা সফল হইল কি না তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।···বিদায়ের বেলা একেবারে আসন্ন—অকস্মাৎ এই ঘোষণায় অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া অজয়া, যদি ভালবাসিয়া থাকে—তবে নিশ্চয়ই প্রামাণিক এমন কিছু করিয়া ফেলিবে যাহা আত্মসম্বরণে সচেষ্ট, বেদনায় কাতর, অথবা রুদ্ধবাষ্পে অস্থির।...কিন্তু, যেখানে সার্থকতা ফলরূপে দেখা দিবার কথা, সেখানে দু'টি একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে কি ঘটিয়া গেল তাহা তাহাকে দেখিতে দিল না ঐ রজত—

রজত তাহার দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছে তাহার ঠিক নাই—

কিন্তু এমন করিয়া চাহিয়া আছে যেন সে একটা কি !... রজতের সেই হাভাতে' দৃষ্টি ঠেলিয়া অজয়ার দিকে চাহিতে সিদ্ধার্থর সাহসই হইল না।—

কিন্তু অজয়ারই প্রশ্নে যখন তাহার সাহসিকতার প্রয়োজনই রহিল না, তখন অজয়ার মুখে কোনো মানসিক বিকারের বাঞ্ছিত রেখালিপির চিহ্নও নাই।

অজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—শেষ অনুরোধ মানে ?

—আমি আজ শেষরাত্রেই যাচ্ছি।

রজত বলিল—কোথায় যাবেন মনস্থ করেছেন ?...অবশ্য বল্‌তে যদি রাষ্ট্রীয় আপত্তি না থাকে।

—কল্‌কাতায় আপাততঃ, তারপর ভগবান যেদিকে নিয়ে যান্‌।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কিন্তু পরিচয় সম্পূর্ণ হ'ল না। বলিয়া অজয়া উঠিল।—

অজয়ার কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থর মন সির্‌ সির্‌ করিতে লাগিল, —মনে হইল, এ যেন সুদূরাগত একটি আহ্বান।...কে জানে কোথায় বাঁশী বজিয়াছে...রব কানে যাইয়া আত্মার সম্বিৎ সচকিত হইয়া উঠিয়াছে...অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট সুর—তবু মন সুরের স্রোত বাহিয়া ছুটিয়া যাইতে চায় যাহার অধরে বাঁশী, তাহারই সন্নিকটে।...কাহারো নাম ধরিয়া সে ডাকে নাই, তবু সে-সুর যেন সবারই আপন-নামে ভরা ..

যে নাম জানে না—

কেবল চেনে উন্মুখ প্রাণটিকে—

সে ত' ঐ সুরেই ডাকে।...

সিদ্ধার্থর মনে হইল, বাহিরে নিঃস্পৃহ, কিন্তু ভিতরে অর্থের অমৃতরসে কূলে-কূলে পরিপূর্ণ হইয়া অজয়ার মুখ-নিঃসৃত কথা ক'টি চতুর্দ্দিক হইতে যেন তাহার বুক-মর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে।...দৈবদত্ত কৃতজ্ঞতাসূত্রে যে পরিচয়ের উদ্ভব, তাহার পরিণতি কোথায় তাহা অনুমান করা ত' মানুষের পক্ষে শক্ত কাজ নয়—

তাহা জানিয়া শুনিয়াও যে আরো বেশী করিয়া পরিচয় পাইতে অভিলাষ করে সিদ্ধার্থর মনে হইল, তাহার মনের ধারাটি ত' উর্দ্ধের ঐ আকাশ আর নিম্নের এই মৃত্তিকার মত চোখের একেবারে সম্মুখবর্ত্তী জিনিস।—

পরিচয় সম্পূর্ণ হইল না, ইহার জন্য বন্ধুভাবে ভদ্রোচিত একটু ক্ষোভ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা সিদ্ধার্থর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু হঠাৎ উল্লাসে আত্মহারা হইয়া তাহার মুখে কথা ফুটিল না।—

রজত অজয়াকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— কোথায়?

—সিদ্ধার্থবাবুর পণ ভাঙ্তে; উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের জলগ্রহণ করবেন না; দেখি, টলা'তে পারি কি না।

অজয়ার স্বরে শ্লেষ ছিল—

কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার হেতুটা সঠিক নির্ণয় করিতে পারিল না ...হইতে পারে আক্রোশ, কিম্বা নারীসুলভ অতিথি বাৎসল্য।

অথবা জিতিবার ঝোঁক।...অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল,—মাপ করবেন; বৃথা—

অজয়া যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; বলিতে লাগিল,—আপনি কি মনে করেন, আপনাকে জলগ্রহণ করাতে না পারলে আমরাও জলগ্রহণ ত্যাগ করবো! তা' নয়...এটা শুধু বাঙ্গালীর ঘরের শিষ্টাচার; বারবার শিষ্টাচার প্রত্যাখ্যান করা কোন্‌দেশী শিষ্টাচার তাই আমি শুন্‌তে চাই।...আপনি বনের মানুষ নন, নিশ্চয়ই জানেন, আপনি যে ব্যবহার করছেন তাতে মানুষ অপমান বোধ করে।

—আমি—

—কৈফিয়ৎ আমি চাচ্ছি নে।...আপনি বেকার অবস্থায় এখানে দিন কাটিয়েছেন; আমাদের সময় কাটাবার উপলক্ষ্য করে' নিয়ে নিজেকে প্রচার করে' গেলেন—আসল কথা এই নয়? বলিয়া অজয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ যথার্থই বিস্মিত হইয়াছিল—

স্বল্পভাষিণী অনস্থির ঐ নারী যে এমন তীব্র উক্তি করিতে পারে তাহা সে স্বকর্ণে না শুনিলে কথনো বিশ্বাস করিতে পারিত না।...নিরুদ্যমের মত মুখ ছোট করিয়া ঐ কথাগুলিকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—আমার সামান্য কথার উপর এতবড় একটা অভিযোগ যে খাড়া করা যেতে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বলিয়া সিদ্ধার্থ একটু হাসি ফুটাইল—

হাসিটি কারুকার্য্যে চমৎকার—

ওষ্ঠদ্বয়ের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদিত হইয়া মধ্যপথে খানিক্ ঢেউ খেলিয়া বাম প্রান্তে মিলাইয়া গেল; যেন বলিয়া গেল এ কি অবাক্ কাণ্ড!...

কিন্তু ভিতরের বার্ত্তা বড় গভীর—

এম্‌নি করিয়া অনাচার দেখাইয়াই ত' সে নিজেকে অদ্ভুত করিয়া তুলিতে চায়!...অসাধারণ না হইলে সে ত' লক্ষ-লক্ষের আসা-যাওয়ার স্রোতে ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া দৃষ্টি-পরিধির বাহিরে চলিয়া যাইবে।...মনে দাগ কাটিবার উপায়ই ত ঐ।...

অজয়ার রাগ দেখিয়া তাই সে খুসীই হইল।

রজত বলিল,—বিস্ময়ের কথা বটে; কিন্তু স্বপ্নেরও অগোচরে এমন সব ব্যাপার ঘটে' থাকে যা' নিতান্তই সাধারণ। আজ যখন জাগ্রত অবস্থাতেই গোচরে এসেছে তখন আর অলীক বলে' উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।

সিদ্ধার্থর খেদ নানাদিক দিয়া বাহির হইতে লাগিল; বলিল, —মানুষ কেমন করে' আর কেন যে নিজেকে এমন পরবশ করে' তোলে তা' বোধ হয় কখনো সে ভেবে দেখ্‌তে চায় নি'।... আমার এই সূত্রপাত।

—অর্থাৎ?

—কোনোদিন আমি আশা করিনি' যে বন্ধুত্বের সম্মান রাখ্‌তে আমায় পরবশ হ'তে হবে; অথচ দেখুন, একমুহূর্ত্তেই আমি চিরদিনের অভ্যাস, সঙ্কল্প আর আদর্শ ত্যাগ করে' প্রস্তুত

হ'য়ে বসেছি, কেবল একটী মানুষকে তৃপ্ত করতে। বলিয়া সেই একটি মানুষের উল্লেখ করিতে সক্ষম হইয়া সে-ও অসামান্য তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল।—

রজত বলিল,—আপনার উদারতা খুব।

অজয়া এবং ননী উভয়ে মিলিয়া জলখাবার ও চা লইয়া আসিল; কিন্তু ননী সেখানে দাঁড়াইল না···দিদিমণির বাড়াবাড়ি আগ্রহ দেখিয়া তাহার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেছে।···

একবার কোথায় ভোজে সিদ্ধার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করিয়াছিল—

তারপর দোকানে সাজান' মেঠাইয়ের পর্ব্বত সে প্রায় প্রত্যহই দেখে—

কিন্তু অজয়াদের নিজের হাতে প্রস্তুত ঐ খাদ্যদ্রব্যগুলি দেখিয়া বমনোদ্বেগে তাহার পাকস্থলী যেন তোলপাড় করিতেছে এম্‌নি করিয়া সেগুলির দিকে চাহিয়া এবং রজত সে চাহনিটা দেখিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধার্থ বলিল,—কৈফিয়ৎ আপনি শুন্‌তে চান্ নি, কিন্তু শুন্‌লে' এতগুলি উত্তপ্ত কথার সৃষ্টি হ'ত না। আমি দরিদ্র—

—আমরা ধনী। ধনীর সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব করেছেন তখন ধনের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। বলিয়া অজয়া খাবার সাজাইতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ বড় কাতর হইয়া বলিতে লাগিল,—যা' নিতান্তই না

হ'লে চলে না, খোরাক্-পোষাক সম্বন্ধে আমি সেই যৎকিঞ্চিতেই অভ্যস্ত ; তার বেশী আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ কর্‌তে পারি নে।

কেহ কথা কহিল না—

রজত মনে মনে বলিল, ন্যাকা।

অজয়া ভাবিল, মহাশয়ের কাতরতা নিষ্ফল।

কিন্তু সঙ্কট দেখা দিল—

সিদ্ধার্থও চা খাইতে বসিয়া গেছে। সুতরাং প্রথম পেয়ালাটি মাটি হয় দেখিয়া রজত বলিল,—অজয়া বোধ হয় জানো না যে, অতিশয় শারীরিক আলস্যের প্রশ্রয় দেয় বলেই বৈরাগ্যসাধনে যে মুক্তি তা' একরকম অবাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠেছে ; এবং জাতি হিসাবে সেটা আমাদের পক্ষে এখন অনধিকার চর্চ্চা। কি বল ?

অজয়া বলিল,—পৃথিবীর লোক কিন্তু তাই চাইছে আজকাল।

—এদিকে ভারতবর্ষের গুরুগিরির দাবি যাঁরা অকাট্য করে' তুলেছেন তাঁরা আমাদের নমস্য ; কিন্তু আমাদের অন্তরের ভাববস্তুটি যতদিন পরের পদানত থাক্‌বে, ততদিন সে সফল হবার আশা বৃথা।

শুনিয়া সিদ্ধার্থ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।—

সংসর্গ হিসাবে সে নিজেকে অপাংক্তেয় অচল মনে করে ; মনে মনে তার কুণ্ঠার অবধি নাই ; সৎসাহচর্য্যের ফলে যে

বৃত্তিগুলির অনুশীলন ঘটে তা' তার ঘটে নাই, এবং তাহা সে জানে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার সম্বিৎ অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া সূক্ষ্মতম আঘাতেই বাজিয়া উঠিতে যেন অনুক্ষণ উদ্যত হইয়াই থাকে—

অতি অল্পদিনেই এই পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়াছে।

সে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠার ভাণ করিয়াছে···তাই রজতের কথাগুলি সে তাহারই বিরুদ্ধে উচ্চারিত মনে করিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—ভাববস্তু কোনোদিন পরাধীন হ'য়ে যেতে পারে বলে' আমি মনে করিনে।

কিন্তু তর্ক উঠিল না—

রজত হাসিতে লাগিল; বলিল,—আপনি শুনে' ফেলেছেন আমার কথা?···ননি আমার কোনো অপরাধ নেই দিদি···

অজয়া প্রথমে ধরিতে পারে নাই; কিন্তু রজতকে চপলকণ্ঠে হাসিতে দেখিয়া এবং তার কথার সুরে সে অনুভব করিল যে, রজত ক্রূর একটা সংঘর্ষ বাধাইয়া তুলিয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে পরম মমতার সহিত তাহার ইহাও মনে হইল যে, এই প্রকার মানসিক সংঘর্ষ-ব্যাপারে সিদ্ধার্থবাবু নিতান্তই অক্ষম প্রতিপক্ষ।··· ওরা কেবল পশ্চাতের সর্ব্ববিধ আকর্ষণ অক্লেশে অতিক্রম করিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিতে জানে; ওদের প্রধান সম্বল তেজস্বিতা, একনিষ্ঠ উগ্র অনুরাগ—

তীক্ষ্ণধার গুপ্ত অস্ত্র লইয়া কে কোথায় উহাদের মনের কার্য্যক্ষেত্র রক্তাক্ত করিতে বসিয়া গেছে, তাহা ওরা ধরিতেই পারে না...এমনি ওরা অসহায়।···ভাবিতে ভাবিতে যখন সে

সিদ্ধার্থর দিকে চোখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার সেই সুকোমল দৃষ্টি-পাত্রে করুণা যেন ধরে না ··

চারি চক্ষুর মিলন হইল—

সিদ্ধার্থ শিহরিয়া উঠিল—

তাহার মনে হইল, তার অষ্টাঙ্গ আর পঞ্চেন্দ্রিয় অপূর্ব্ব একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণে একটি কোষের আকার ধারণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই দৃষ্টির অমৃত-দানে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহা অচিন্ত্যনীয় সুখের মাঝে চিরজীবনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল।

রজত দ্বিতীয় পেয়ালাটি সম্মুখে করিয়া সিদ্ধার্থর গান শুনিল; এবং গান শেষ হইলে বলিল,—সঙ্গীতকে সুধা কেন বলে আজ তা' হৃদয়ঙ্গম হ'ল।···সমগ্র মনটা ডানা মেলে সুরের ভেতর হুল ফুটিয়ে স্থির হ'য়ে বসে' রস শোষণ করে' নিচ্ছিল, আর রসের মাধুর্য্যে তার অভ্যন্তরটা তোলপাড় কর্‌ছিল।...আজ আমার চা খাওয়া বৃথা আর সার্থক এক সঙ্গে হ'য়ে গেল।

সিদ্ধার্থ হাসিয়া বলিল,—পরস্পর-বিরোধী দু'টি শব্দের একত্র প্রয়োগ—

—ন্যায়শাস্ত্রে চলে না সত্য; কিন্তু চেয়ে দেখুন—দ্বিতীয় পেয়ালার চা এক চুমুকও খাই নি, সুতরাং বৃথা হয়েছে; এদিকে চা-পান উপলক্ষ্য করে' এমন গান শোনা গেল যাতে আসাম পর্য্যন্ত সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

(১৯)

সবাই কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

সিদ্ধার্থ নিজের ঘরটিতে দিব্য চৌকা হইয়া বসিয়া আপন-মনেই আনন্দ করিতেছিল—

কন্দর্প পুষ্প-শরাসনে শরযোজনা করিয়াছেন, কিন্তু ধ্যানভঙ্গে ললাটনেত্রের বহ্নি ছুটাইয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করিতে সে উদ্যত নহে...

নিজে সে মহাদেব নয়—ভাবিয়া সিদ্ধার্থ মনে-মনেই একটু হাসিল—

তারপর কল্পনা করিতে লাগিল,—সর্ব্বাঙ্গে মুহুর্মুহুঃ শিহরণ জাগিয়া উঠিতেছে—নবোদ্গত কদম্বকেশরের মত...দৃষ্টিতে অনন্ত আবেশ...আনন্দ, ব্যথা আর করুণার তিনটি স্রোত পাশা-পাশি বহিয়া চলিয়াছে...দু'ধারে চির-বসন্তের পুষ্পিত স্ফূর্ত্তি...আকাশে আলোক-বন্যা, ত্রিস্রোতার বক্ষে তাহারি প্রতিবিম্ব চল চল করিতেছে...

সে ভালবেসেছে।

কিন্তু সিদ্ধার্থ ষোলআনাই বর্ব্বর নয়—

অজয়ার অন্তর-বাহির তাহাকে এক হাতে কাছে টানিতেছে, অন্য হাতে দূরে ঠেলিতেছে।—অজয়া তাহাকে ভালবাসিলে কত দিক্ দিয়া কত সুবিধা হইবে তাহা সে তেম্‌নি জানে, যেমন জানে সে নিজের চির-অপরাধী অপরার্দ্ধকে...

আনন্দ তাব ভাটার টানে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল—

আবার জোয়ার আসিতেও বিলম্ব হইল না—

পৃথিবী ত' আমারি প্রতিরূপে পরিপূর্ণ। আমি কি একা দোষী? নিজে যা' নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তা-ই প্রতিপন্ন কর্‌বার প্রাণান্ত প্রয়াস ত' প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ। কে কবে নিজেকে অকপটে প্রচার করেছে?...অধর্ম্মের পরাজয় হবেই বলে' বিভীষিকা দেখাবার একটা আয়োজন আছে বটে, কিন্তু সে বৃথা—পরাজয়ের ভয়ে অধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়নি'।...অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারতে যে-পরাজয় ঘোষিত হ'চ্ছে সে-পরাজয় অসম্পূর্ণ... সে-পরাজয়ের গরিমা জয়লক্ষ্মীকে অশ্রুমুখী করে' তুলেছে।

এইখানে একটু সবল বোধ করিয়া সিদ্ধার্থ হাসিয়া উঠিল—

আমি দেশভক্ত; দেশের দুর্দ্দশা দেখে আমার আহার নিদ্রা পালিয়েছে।...আমার মা নেই, বাপ নেই, আমি অনাথ...এত গল্পও জানতাম!.. মা না থাকার গল্পটা বেশ কাজে লেগেছে... তাকে কাঁদিয়েছে।...

শুন্‌তে পাই, জীবন-যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কীট-পতঙ্গে আছে, উদ্ভিদেও আছে—সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা।

তবে আমি মানুষ হ'য়ে কেন টিকে থাক্‌তে চাইব না ?...মনে মনে তাল ঠুকিয়া বলিল—আলবৎ চাইব।...কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ্ রং বদলায় ; আমি একটু নাম বদলেছি ; কিন্তু মানুষ ত' আমি সে-ই আছি।...ধরণী সব সুখ কৃপণের মত লুকিয়ে রেখেছিল—এতদিন পরে তার এক অঞ্জলি তপস্যার ফলের মত আমার সম্মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে ; কেন আমি তা' দু'মুঠো ভরে' কুড়িয়ে নেব না ! দেবতা পূজান্তে আমায় বাঞ্ছিত বর দিয়েছে ; আমি কেন তা' প্রত্যাখ্যান ক'রবো !...কেউ কখনো তা' করেনি।...আচার্য্য সেদিন বক্তৃতায় বল্‌ছিল, পাপ একবার প্রবেশ করলে সে ক্ষত খনন করেই চলে—সে-ক্ষতের ধন্বন্তরি প্রেম।...প্রেমই বটে। আজ আমার মনে হচ্ছে—অতীত আর বর্ত্তমানের মাঝখানে একটা পূর্ণচ্ছেদের রেখা টেনে দিয়ে আমি—

—"সিদ্ধার্থবাবু, প্রাতঃপ্রণাম"—

শুনিয়া সিদ্ধার্থ পূর্ণচ্ছেদের অসমাপ্ত রেখার উপর একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিল।... তার সুখস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তেই যেন অসংখ্য হিংস্র নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।...কালো দু'খানি হাত অক্লান্ত আগ্রহে মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে ; মানুষের সাধ্য নাই সেই হাতের গতি সে বন্ধ করিয়া দেয়।

সিদ্ধার্থ হতাশ্বাস শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

কিন্তু রাসবিহারী যেন তামাসা পাইয়া গেল ; হাসিতে হাসিতে বলিল,—এতদিন পরে দেখা ; প্রতি-নমস্কারটাও করলে না !

—শিথিল হ'য়ে গেছি, বন্ধু।

—তাই দেখ্‌ছি। তোমায় আমি সর্ব্বত্র খুঁজেছি, তা' বোধ হয় জান না। বলিয়া রাসবিহারী অনাহূতই বসিল; তার কাজ ছিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—আমার সৌভাগ্য যে আমার জন্যে এত কষ্ট করেছ। কারণটা কি শুনি?

—সাক্ষ্য দিতে হবে যে!

—কিসের?

—ভুলে গেলে? সেই খতের। তুমি যে, ভাই, লেখকসাক্ষী; উভয়পক্ষের হিতৈষী।

শ্লেষের কোনো প্রয়োজনই ছিল না—

এবং তাহা সিদ্ধার্থকে স্পর্শও করিল না—

কিন্তু সে হঠাৎ আহত জন্তুর মত বিকৃত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—আমায় মেরে' ফেল রাসবিহারী···আমি তোমার কি করেছি যে তুমি আমায়—

বলিতে বলিতে সিদ্ধার্থ হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিদারুণ একটা দ্বন্দ্বের আর বিবেকবুদ্ধির লাঞ্ছনার মাতামাতির মধ্যে সিদ্ধার্থের দিন কাটিতেছে—বড় কষ্টের দিনগুলি; তার আত্মগ্লানির সীমা নাই···

থাকিয়া থাকিয়া আনন্দে আশায় সে পরিপূর্ণ হইয়াও উঠিতেছে—তবু ক্লান্তি আসিয়াছে, আর বলক্ষয়কর কেমন একটা আতঙ্ক।—

সিদ্ধার্থ প্রাণপণে যাহা ভুলিতে চায়, রাসবিহারী যেন তাহারি নিষ্ঠুর অভিজ্ঞান লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—

জোঁক যেমন শিকারের রক্তে পূর্ণ হইয়া আপনি খসিয়া পড়ে—

সিদ্ধার্থর মনে হইতে সুরু হইয়াছিল, তার অতীত তার বুকের রক্তে স্থূল ভারাক্রান্ত হইয়া তাহার জীবনের অঙ্গ হইতে তেমনি বিচ্যুত হইয়া গেছে—

কিন্তু তা' হয় নাই—

তাহার ঐ অনুভূতি যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, আর সে যে আত্ম-প্রবঞ্চক, রাসবিহারী তাহাই যেন তাহার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।—সত্য যাহাকে প্রাণের ব্যগ্রতায় আড়ালে রাখিতে চায় তাহাকেই যে-কপট সম্মুখে টানিয়া আনে সে ত' মানুষকে কাঁদাইবেই।—

সিদ্ধার্থর কান্না দেখিয়া রাসবিহারী হাসিল না; বলিল,—ও হোঃ।…আচ্ছা, আজ থাক্; আজ তোমার মন ভাল নেই।

কিন্তু এ দরদে সিদ্ধার্থর যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র উপশম হইল না; গলদশ্রুলোচনে বলিতে লাগিল,—আমার মন! আমার মন আমার নেই, সে তোমার ক্রীতদাস; তার গলায় শিকল বেঁধে ছেড়ে দিয়েছ; যখন ইচ্ছা তাকে টেনে নিয়ে নিজের কাজে লাগাচ্ছ। আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমায় মুক্তি দাও, রাজবিহারী!

বলিয়া বড় ব্যাকুলনেত্রে সে রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

যেন রাসবিহারী দয়া করিয়া তার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেই বানপ্রস্থ অবলম্বনের পথে তার আর কোনো বিঘ্নই থাকে না।

কিন্তু সিদ্ধার্থর সর্ব্বস্ব বলিতে কি বুঝায়, তাহা রাসবিহারীর চোখের উপরেই আছে ; তাই সে হাসিয়া বলিল,—তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে ত' আমি রাতারাতি রাজা হ'য়ে যাব ; সে কোন কাজের কথাই নয়। আমায় এই দায়ে উদ্ধার ক'রে দাও—তারপর তুমি মুক্ত।

এটা যে দায় নয়, তাহা সিদ্ধার্থর মনেও পড়িল না—

সে যেন ডুবিতে ডুবিতে মুক্তির কথায় পায়ের তলায় মাটি পাইয়া গেল ; আকুল হইয়া বলিল,—দেবে মুক্তি ?

—নিশ্চয়।

—আর কখনো আমায় সিদ্ধার্থ বলে' সম্বোধন করবে না ? দেখা হ'লে—

—এমন ভাব দেখাব যেন তোমায় আমি চিনিও না। বলিতে বলিতে রাসবিহারী ক্রোধ অনুভব করিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—শপথ করছ ?

রাসবিহরী ভ্রূভঙ্গী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল—তোমার অকৃতজ্ঞতায় আমি অবাক্ হচ্ছি।...যখন লিখেছিলে তখনই তোমার বোঝা উচিত ছিল, এ কাজের শেষ এইখানেই নয়।...

একগাল হেসে' হাত ভরে' টাকা নিয়েছিলে—তখন ত' আমায় চক্ষুঃশূল মনে হয়নি…টাকার দিকে চেয়ে তখন ত' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নাওনি ; তখন বুঝি পাওনাদার গলা টিপে ধরেছিল? বলিয়া রাসবিহারী রাগের ধমকে যেন ধুঁকিতে লাগিল।

কথাগুলি মিথ্যা নয়—

সিদ্ধার্থ তাহা স্বীকার করিল ; বলিল,—অপরাধ হয়েছিল, আমায় ক্ষমা করো। এখনকার মত আমায় ছেড়ে দাও…আমার দম্ বন্ধ হ'য়ে আস্ছে।

—তা' আসুক্।…শেষ কথাটা বলে যাই। তখন নিজের গরজে নগদ টাকা দিয়ে ফেলেছিলাম, হ্যাণ্ডনোটে উশুল দেওয়া হয়নি। আমি ছা-পোষা মানুষ ; টাকা ত' বেশীদিন ফেলে' রাখ্তে পারিনে। সুদটা কবে দিয়ে ফেল্বে, জিজ্ঞাসা কর্তে পারি কি?

কিন্তু জিজ্ঞাসার উত্তর সে পাইল না—

সিদ্ধার্থ তখন অশেষ মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—

মানুষের প্রাণে এত সয়!—

বসুমতীর বুকের ভিতর দ্রবীভূত অগ্নি যেমন আছে, তেম্নি সুশীতল জলস্রোতও বহিতেছে।…কিন্তু তার বুকে কেবল আগুন। যদি কোনো ভগীরথের শঙ্খধ্বনির পিছু পিছু যদি কোন সুরধুনী তাহার বুকের দিকে নামিয়া আসে, তবে সে ত' এই অগ্নির তাপে বাষ্প হইয়া যাইবে…

ত্রাস সিদ্ধার্থর মুখে চোখে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল—

অঞ্জয়ার ভালবাসাই ত' সুরধুনী ; তাহার পানে নামিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু—

সিদ্ধার্থের মনে হইতে লাগিল, আত্মহত্যা করিয়া এই যন্ত্রণার সে শেষ করিয়া দেয়।...

রাসবিহারী বলিল,—আমার শেষ কথাটার উত্তর পাইনি।

সিদ্ধার্থ এমন দু'টি চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল যেন সর্পের যাদুদৃষ্টির সম্মুখে পক্ষিশিশুর মূর্চ্ছিত প্রাণটুকু ভিতরে কেবল ধুক্‌ধুক্ করিতেছে।—

সিদ্ধার্থের বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল না—

নিঃশব্দে আঙ্গুল তুলিয়া নির্গমের পথটা সে রাসবিহারীকে দেখাইয়া দিল।

চূড়ান্ত অপমান বোধ করিয়া রাসবিহারী দুপ্‌দাপ্ শব্দ করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

...সিদ্ধার্থের মনে হইতে লাগিল,—সে যেন পরকালের ফের্‌তা মানুষ ; জীবিতের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আর মৃতের শীতল স্পর্শ—এই দু'টির ধাক্কায় দক্ষিণে-বামে সে অবিরাম দোল খাইতেছে।...

পুরাতন বন্ধুরা শত্রু হইয়া উঠিয়াছে—

অথচ যার জন্য এত ক্লেশ, তার সম্মুখীন হইলেই জিহ্বা শুকাইয়া ওঠে।...হঠাৎ একদিন সে এমন ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, যার কোনো অর্থ করাই যায় না।—তাহার দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে ; সবাই চম্‌কিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল,—সিদ্ধার্থবাবু

কি ভূত দেখে' এলেন ? শুনিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল ; তারপর আর সেখানে সে যায় নাই।···সেইদিন হইতে সে মনের চোখ দিয়া প্রাণপণে কেবলই নিজের বাহিরের চোখ দু'টিকে দেখিতেছে—

সেখানে যেন ভয় থম্ থম্ করিতেছে—

শূন্যতা তার ভয়ঙ্কর।

দু'দিন পরে বিমল রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল—

সিদ্ধার্থকে দূরে আসিতে দেখিয়া সে আপন মনেই বলিতে লাগিল,—সিদ্ধার্থবাবু আসছেন। বেচারা রোগা হ'য়ে গেছে। গরীব হওয়া কি আপদ্ বাবা, না খেতে পেয়ে রোগা হ'য়ে যেতে হয়।...কাজের লোক ছিল আমার বাবা ; গরীব হবার ভয় রেখে যায়নি। দাদা কথায় কথায় বলে, না পড়লে খাবি কি ক'রে ? মনে হয়, মুখের ওপর বলে দি' তুমি যা' করে' খাচ্ছো, আমিও তা-ই করে' খাব। ওঁরা ভাবেন, আমি কিছু জানিনে, শর্ম্মা সব জানে।···সিদ্ধার্থবাবু ?

সিদ্ধার্থ ঘাড় হেঁট করিয়া চলিতেছিল—

এইমাত্র একটি পাওনাদার তাহাকে বড় অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে ; পাঠান্ কেবল ঘাড়ে হাত দেয় নাই।—

বিমলের ডাকে ভাবনার মাঝে সে চম্‌কিয়া উঠিল। বলিল, —হ্যাঁ, আমি। আমার নামটা মনে আছে দেখ্‌ছি।

—না থাকাই বিচিত্র। যে-সব হাসির গল্প করে' গেছেন

আপনি, তা' নিয়ে এখনো আমাদের হাসাহাসি চলে।...আসুন, দিদি ডাকছে।

—রজতবাবু কোথায় ?

—গবেষণা করছেন।

—দিদি ডাকছেন, কে বল্‌লে ?

—দিদি নিজে। জানলায় দাঁড়িয়েছিল ; আপনাকে আসতে দেখে' বল্‌লে, সিদ্ধার্থবাবু আসছেন ; ধরে' নিয়ে আয়।

—চলো।

—আপনি উঠুন ; আমি আসছি।

সিদ্ধার্থ থামিয়া থামিয়া উঠিতে লাগিল—

সিঁড়ির এক ধাপ সে ওঠে, আর একটু করিয়া দাঁড়ায়... সংশয়াকুল অন্তরে তার তিলার্দ্ধ স্বস্তি নাই—

নিজেকে মুহুর্মুহুঃ লক্ষ্য করিয়া মনটা তার যেমন অস্থির, দেহ তার তেম্‌নি বিবশ।

অজয়া জানলার ধারেই দাঁড়াইয়াই ছিল—

সিদ্ধার্থ শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াই সম্মুখে যেন বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া অপার বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল—

রৌদ্র ঘরে ঢুকিতেই অজয়ার চুলের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে ; তাহার পায়ের নীচে দীর্ঘ ছায়া ব্যথিত হৃদয়ের একটি ম্লান নিঃশব্দ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত লুটাইতেছে—

সিদ্ধার্থর মনে হইল, সাগর-গর্ভ হইতে উঠিবার সময় লক্ষ্মীর বরাঙ্গের উত্থিত অর্দ্ধ সূর্য্যালোকে ঠিক এম্‌নি উদ্ভাসিত হইয়াছিল—

দেবতাগণ উল্লাসে বিস্ময়ে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন—

তাঁর একহস্তে ছিল সুধার কলসী, অন্য হস্তে—

অজয়া হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইল; বলিল,—এসেছেন? আপনার কথাই ক'দিন থেকে' ভাবছি। বসুন; আস্‌ছি। বলিয়া সে অন্যঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু সিদ্ধার্থর বসিবার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই রহিল না।... অজয়ার এই ভাবটি একেবারে নূতন···যেন শাসাইয়া রাখিয়া গেল।—

তার কল্পনা-পক্ষী উড়িতেছিল, ত্রেতার সমুদ্রমন্থনের উপর—

কিন্তু অজয়ার কথায় সে পাখা গুটাইয়া বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণতম কোটরে প্রবেশ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।...

অজয়া কি তার দাদাকে ডাকিতে গেল!...সব কি ফাঁস হইয়া গেছে!...

সিদ্ধার্থর মনোরথ একমুহূর্ত্তে পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া আসিল—কোথাকার বাতাস আসিয়া ধর্ম্মের কল নড়াইয়া দিতে পারে।

কিছুই ভাল করিয়া চোখে পড়িল না; তবু সিদ্ধার্থর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।—

কিন্তু অজয়া তার দাদাকে ডাকিতে যায় নাই; সে একখানা বই লইয়া আসিল; বইখানা সিদ্ধার্থরই।

বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া অজয়া বলিল,—আপনারই জিনিষ; একদিন দৈবাৎ ফেলে' গিয়েছিলেন। এর সঙ্গে আর একটা জিনিষও আপনাকে ফেরত দিচ্ছি।—বলিয়া অজয়া বইয়ের উপর যে জিনিষটি রাখিয়া দিল, সিদ্ধার্থ তাহাকে খুব চেনে।

হৃদ্‌পিণ্ড ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া সে সেইদিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া রহিল—

অজয়া বলিল,—চেনেন নিশ্চয়ই কাগজখানাকে...আপ্‌নারি বেনামী হৃদয়োচ্ছ্বাস।

ভয়ে সিদ্ধার্থর মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল—

অজয়া বলিতে লাগিল,—এই গুপ্তকথা... অপরিচিতার কাছে ঘৃণ্য উপায়ে ব্যক্ত না ক'রে গোপন রাখলে দু'পক্ষেরই সম্ভ্রম রক্ষা হ'ত।

সিদ্ধার্থ কি বলিতে যাইতেছিল—

কিন্তু অজয়া তাহাকে পথ দিল না; বলিল,—অস্বীকার কর্‌বেন না; অস্বীকার কর্‌লে কুকার্য্যের কটুত্ব বাড়ে বই কমে না।

অজয়ার কণ্ঠস্বরে ভৎর্সনা নিশ্চয়ই ছিল—

এবং তাহার সঙ্গে আরো কি একটা পদার্থ মিশিয়া ছিল, এত ভয় ছাপাইয়াও যাহা সিদ্ধার্থর কানে বড় মিষ্ট লাগিল। সিদ্ধার্থর বুক দুরু দুরু করিতেছিল...এত আয়োজন বুঝি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতির কারচুপিতেই পণ্ড হইয়া যায়; কিন্তু অজয়া ত' অপ-

মানে রাগিয়া আগুন হইয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে আদেশ করিল না—

উপরন্তু এমন একটু সুর যেন বাজিল—যাহা কৌতুকে স্নিগ্ধ, গোপন আনন্দে মধুময়।···তখনই সিদ্ধার্থর ভয় কাটিয়া মনে হাসি ভাসিয়া উঠিল ; কিন্তু স্পষ্ট সে হাসিল না—

হাসাটা উচিতও হয় না—

বলিল,—অস্বীকার আমি করছিনে, স্বীকারই করছি।—তারপর চোখ নামাইয়া বলিল,—কিন্তু আমার সান্ত্বনা এই যে, তখন আমি প্রকৃতই উন্মাদ, আর মৃত্যুকামী।...আমিও মর্ম্মপীড়া কম ভোগ করি নি'।

—উন্মত্ত অবস্থাটা কতদিন স্থায়ী হ'য়েছিল তা' আপনিই জানেন। সুস্থ হ'লে কেন স্বীকার করেন নি ? ধরা পড়ে' মর্ম্ম-পীড়া দেখালে তাকে মেনে' নিতে পারি নে।

—কিন্তু যা' লিখেছিলাম তা' অনাবিল সত্য। মরতে উদ্যত হয়েও আপ্‌নাকে দেখেই আমি মরতে পারি নি'।—বলিয়াই নিজেকে অতিশয় সঙ্কটে পতিত মনে করিয়া সিদ্ধার্থ অস্থির হইয়া উঠিল···না জানি অদৃষ্টে কি আছে !···তার কথাগুলি যেন প্রণয়োক্তি...আর, সুস্পষ্ট প্রণয়-নিবেদনের প্রান্তে আনিয়া যেন তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে—

ইহার পর মাত্র দু'টি কি তিনটি প্রশ্ন—

এবং তারপরই একেবারেই খোলাখুলি বলা—আমি তোমায় তখনই ভালবেসেছিলাম।···কিন্তু অজয়ার ঠিক্ চোখের সম্মুখে

বসিয়া সিদ্ধার্থর ক্ষুদ্র হৃদয় সহসা অতটা ভরিয়া উঠিতে ভয়ে দিশে-হারা হইয়া গেল—

অজয়া তাহার বিপন্ন মূর্ত্তির দিকে যেন কেমন করিয়া চাহিয়াছিল—

সিদ্ধার্থ খানিক নীরব থাকিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল,—আমি বড় কদর্য্য আর নির্ব্বোধ; অপ্রয়োজনের কাজেই আমি চিরদিন কাটিয়ে এসেছি। আমায় মাপ করুন। মুহূর্ত্তের ভুলে—

অজয়াও বিপদে পড়িয়াছিল—

সমগ্র ব্যাপারটা সিদ্ধার্থর কাতরতার জন্যেই হঠাৎ একটি কথায় তুচ্ছ করিয়া তোলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; অথচ তার ইচ্ছা নয় সে আর কষ্ট পায়—

সিদ্ধার্থ আর অজয়া উভয়কেই আসান দিল ননী; সে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া দাঁড়াইল,—কি হ'চ্ছে দু'টিতে?

অজয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল—

কিন্তু হাসিয়া বলিল,—ননি, তোর কথাই ঠিক্। তোড়া সিদ্ধার্থবাবুই পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য মুহূর্ত্তের ভুলে; তারপর মর্ম্ম-পীড়ায় খুব ভুগেছেন।…বসুন, চা করে আনি।

অজয়া ও ননী চলিয়া যাইতেই সিদ্ধার্থর যে অবস্থা ঘটিল তাহার সংক্ষিপ্ত কোনো বর্ণনা নাই…

তাহার মনে হইতে লাগিল, আকাশ নিংড়াইয়া সে এখন

তার নিবিড়তম জ্যোতিঃবিন্দুটির মালিক ; আর, সমুদ্র নিংড়াইয়া সে এখন তার গাঢ়তম সুধানির্য্যাসের অধিকারী—

মোট কথা, ব্রহ্মাণ্ডের সারাংশ এখন তার।

সঙ্কটে আশাতীতভাবে উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধার্থর যতটা উল্লাস ঘটিয়াছে, ননীর প্রশ্নে ঘটিয়াছে তার চতুর্গুণ। ...তিনটি শব্দে তৈরী একটি প্রশ্নে ননী সারাপ্রাণে এ কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত-স্রোত বইয়ে দিয়ে গেল ...আর দু'টি নরনারীকে চিরন্তন মিলনের কোলে তুলে' দিয়ে গেল তিনটি শব্দের মালায় গেঁথে !...দু'টি প্রাণ বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নেই ; কেবল একটিমাত্র সাক্ষী একটি নারী—

সে পুলকিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে—কি হ'চ্ছে দু'টিতে ?

সিদ্ধার্থ প্রাণসংশয়কর জবাবদিহির মধ্যে পড়িয়াছিল ; ঐ প্রশ্নটি বিষঘ্ন মন্ত্রেব কাজ করিয়াছে ; কিন্তু অকৃতজ্ঞ সিদ্ধার্থর মনে হইল,—ফুলটিকে কেন ফুটেছিস্ জিজ্ঞাসা করার মত এ প্রশ্ন অনাবশ্যক ; তার অর্থ নেই, উত্তর নেই...শুধু চোখে চোখে চেয়ে দু'জনারই মুখে ফুটে' উঠবে ধ্রুবতারার মত দীপ্ত, বুকে আর ধরে না এমনি উদ্বেলিত প্রেমের ঢলে'-পড়া উৎসের মত একটুখানি হাসি। ...প্রেমবিহ্বল দু'টি নরনারীর অশ্রান্ত অফুরন্ত কুজনের মাঝখানে সেই একই সুরে বাঁধা কৌতুকময়ী সখীর স্মিত প্রশ্ন— কি হ'চ্ছে দু'টিতে ?—

সিদ্ধার্থ ভাবিল, প্রশ্নটি আশু ভবিষ্যতের শুভ-সূচনা···আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গনের উপর কল্যাণীর আশীষ-স্পর্শ।

সেই দিনই—

কিন্তু স্থানান্তরে, রজত বিরক্ত বোধ করিতেছিল; বলিল,—আজ বারান্দায় চায়ের আয়োজন হ'ল কি সুবিধে ভেবে, আমি সেই কথাটা খুব ভাব্‌ছি, অজয়া।

—অসুবিধে কি হ'য়েছে তা' বলো।

—আমার অসুবিধেটা তোমার চোখে পড়ল না এটা একটা নতুন কথা বটে, কিন্তু এ নতুনে মনোহারিত্ব নেই। বলিয়া রজত মুখ কটু করিল।

—তুমিই বলে' থাকো, রোজকার বাঁধা কাজের অতিরিক্ত কাজ মাঝে মঝে করা উচিত, তাতে মানুষ কর্ম্মঠ আর সপ্রতিভ হয়। কিন্তু আমরা কাজ করিনে, আমরা করি সেবা; তোমাদের অভ্যাসগুলোকে আদর দিয়ে চলি। অভ্যাসের বাইরে গিয়ে পড়্‌লে কেমন লাগে তার আস্বাদ মাঝে মাঝে পেলে উপকার হয়—তাতে পুরুষের ধৈর্য্য বাড়ে।

—কিন্তু ধৈর্য্য জিনিষটা স্থিতিস্থাপক, বাড়ালে' সে বাড়ে; কিন্তু প্রাণপণ টান থাকে তার ভেতরের যে অবস্থান কেন্দ্রটিকে সে ছেড়ে' এসেছে তারি দিকে।...বেশী বাড়ালে ছিঁড়ে যায় তারও দৃষ্টান্ত আছে।

অজয়া হাসিয়া বলিল,—একটা গানের জন্যে এত কথা! বড় সৃষ্টিছাড়া বদ্‌অভ্যাস করেছি কিন্তু।

—তা' মানি।...কে যেন বলেছেন, দুষ্মন্ত প্রথমটা বুঝ্‌তেই পারেন নি,' তিনি একা শকুন্তলাকে ভালবেসেছেন, কি সখিদু'টি-

সমেত যে শকুন্তলা তাকে ভালবেসেছেন। আমিও জানিনে, আমি শুধু চা ভালবাসি, কি সুরের আর স্বাদের সম্মিলনের ফলে যে আরামটি উৎপন্ন হয় তাকে ভালবাসি। কিন্তু তোমরা তা' বোঝ না—ভাবো, সবই বুঝি ভারতছাড়া কাণ্ড! মহাভারতেও—

সিদ্ধার্থ বলিল,—এ-সবের উল্লেখ নেই।

—ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর কোনো কবির প্রক্ষিপ্ত বাক্য বলে' সে-অংশ ছেঁটে দেওয়া হয়েছে।

—কিন্তু অনিষ্টের মূল আমি।

—কারণ?

—স্থান-নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হয়েছিল আমার ওপর। বলিয়া সিদ্ধার্থ পুলক অনুভব করিতে লাগিল; কথা-কাটাকাটিতে সে আর অজয়া একদিকে।...

রজত বলিল,—অবিলম্বে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

—চলুন।

সবাই উঠিয়া পড়িল; সর্ব্বাগ্রে রজত, তার পশ্চাতে অজয়া এবং তার পশ্চাতে সিদ্ধার্থ—

কিন্তু দু'তিন পা অগ্রসর না হইতেই সিদ্ধার্থ অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল; এবং পরক্ষণেই ব্যাপার তুমুল হইয়া

অজয়া "দাদা" বলিয়া যে ডাকটা দিল তাহাকে আর্ত্তনাদ বলা চলে; ননী কাছাকাছিই ছিল; সে পাখা আনিতে ছুটিয়া গেল; এবং সে মাণিক ও মদনকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়া

সিদ্ধার্থর নিকটবর্ত্তী হইতেই অজয়া তাহার হাত হইতে পাখা টানিয়া লইয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতে লাগিয়া গেল।...

কিন্তু সিদ্ধার্থর অচৈতন্য অত ত্বরিতে ভাঙ্গিল না।

স্মেলিং সণ্টের শিশি আনিতে ননী পুনরায় ছুটিয়া গেছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না; মদন আর মাণিক কি করিবে আদেশের অভাবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া দিশেহারা হইয়া আছে; বরফের কথাটা রজতের মনে আসিয়াও আসিতেছে না—

এমন সময় সিদ্ধার্থ মাথায় হাওয়া লাগিয়া ধীরে ধীরে চোখ খুলিল, এবং তখনই আবার চোখ বুজিয়া চরম ক্লান্তস্বরে বলিল,—আমি কোথায়? অজয়া—

বলিয়া দ্বিতীয়বার চোখ খুলিয়া সিদ্ধার্থ একটু উঠিবার চেষ্টা করিল।

অজয়া পাখা থামাইয়া বলিল,—উঠ্‌বেন না; যেমন আছেন তেম্‌নি থাকুন। একটু সুস্থ বোধ কর্‌ছেন?

সিদ্ধার্থ যেমন ছিল তেম্‌নি থাকিয়া বলিল,—কর্‌ছি।

রজত বলিল,—কথা বলিও না। স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য; একটু বিশ্রাম কর্‌লেই ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন। ধরে' উঠিয়ে চেয়ারে নিয়ে বসাও।—(মাণিকের প্রতি)—দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছিস্‌?

অকারণে ধমক্‌ খাইয়া মাণিক তাড়াতাড়ি যাইয়া সিদ্ধার্থর এক ডানা ধরিল; সিদ্ধার্থ চোখ আবার বন্ধ করিয়াছিল; রজত তার অপর ডানা ধরিল; বলিল,—আপনাকে নিয়ে চেয়ারে

বসাব; উঠুন্ ত' আস্তে আস্তে। বলিয়া মাণিকের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে সিদ্ধার্থকে তুলিয়া লইয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল।—

ননী স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু স্মেলিং সল্ট্ কাহারো নাকে লাগাইবার দরকার হইল না।

অজয়া বলিল,—ননি, খানিকটা দুধ গরম করে' নিয়ে আয়, শীগ্‌গির; দেরী করিস্ নে।...তারপর সিদ্ধার্থকে বলিল,—মাথা এখনো ঘুর্‌ছে?

সিদ্ধার্থর তখনকার লজ্জা আর সঙ্কোচ দেখিবার জিনিষ; বলিল,—সামান্য। আপনারা আর ব্যস্ত হবেন না—ক্রমশঃ কমে আস্‌ছে। বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—আমি যাই, আপনাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছি, উপদ্রব করেছি, আর নয়।...তারপর সিদ্ধার্থ ঠোঁটের কোণ মুচ্‌ড়াইয়া একটু হাসিল... এম্‌নি করিয়া যেন তার সর্ব্বান্তঃকরণ ক্ষমা চাহিয়া চাহিয়া উহাদের পায়ে লুটাইতেছে।

কিন্তু অজয়া রাগিয়া একেবারে খুন হইয়া গেল; বলিল,—আপনি আমাদের রক্তমাংসের মানুষ মনে করেন, না রাক্ষস মনে করেন? যাই বলে' উঠে' দাঁড়ালেই যেতে পারবেন ভেবেছেন? বলিতে বলিতে রাগে তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।...

অজয়া দুধের তাগিদ্ দিতে গেছে।—

রজত বলিল,—দুধটুকু অক্লেশেই খেয়ে ফেল্‌তে পারবেন;

গরম গরম পেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার হবে। তারপর আপনি কিঞ্চিৎ সবল বোধ করলে গুটিকতক কথা জান্‌তে চাইব, দয়া করে' আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে।

শুনিয়া সিদ্ধার্থ আবার আসনগ্রহণ করিল।—

দিব্য ঝক্‌ঝকে কাঁচের গ্লাসে করিয়া অজয়া আধসেরটাক্ ধূমায়মান দুগ্ধ লইয়া আসিল—

কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সিদ্ধার্থ পনর আনা সবল হইয়া উঠিয়াছে।... রজতের গুটিকতক কথা কিসের সম্পর্কে হঠাৎ এখন জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুমান-সূত্রে সিদ্ধার্থর জানা হইয়া গেছে, এবং তাহাতেই রক্ত উষ্ণ হইয়া ধমনীর বেগ বাড়িয়াও যেটুকু দুর্ব্বলতার আভাস ছিল তাহাও দূর হইয়া গেল অজয়ার আসায়—

রজতের জিজ্ঞাসার উত্তর সে অজয়ার সম্মুখেই দিতে পারিবে।

বলিল,—গুটিকতক কথা বল্‌বার মত জোর আমি পেয়েছি; জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া দুধটুকু সে চোঁ চোঁ করিয়া প্রায় এক চুমুকে শেষ করিয়া আনিল।

রজত বলিল,—আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়টি জান্‌বার প্রয়োজন হ'য়েছে; অশিষ্টতা মার্জ্জনা করবেন।

—আমার নাম কি তা জানেন; পিতার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু; নিবাস হেমন্তপুর, জেলা হুগলি। পিতৃদেব লাহোরে চাকরী করতেন—সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়; আমি তখন মাতৃগর্ভে। পিতা উপার্জ্জন করতেন যথেষ্ট; কিন্তু পরে শুনেছি তাঁর আয়ের অধিকাংশই ব্যয় হ'ত দানে।...শৈশবটা কি-ভাবে

কেটেছিল জানিনে।...যখন নিজের দিকে দৃষ্টি দেবার মত বয়স হ'ল, তখন আমি ইস্কুলের অবৈতনিক ছাত্র। বৃত্তির টাকার জোরে এম, এ, পর্য্যন্ত উঠে হঠাৎ একদিন মনে হ'ল—কিসের আশায় এই পণ্ডশ্রম করে মরছি?...পিতা নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব করে' দান করে' গেছেন...আমার দান করবার মত আছে শুধু বলিষ্ঠ এই দেহখানা।...দেশের আর দশের কাজে দেহপাত ক'রবো বলে' বেরিয়ে এসে দেখি—

কি দেখিয়াছিল কে জানে; কিন্তু বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল; এবং রজতদের মনে হইল, তাহার দৃষ্টি যেন তাহাদের ডিঙ্গাইয়া, ঘর ডিঙ্গাইয়া, বাড়ী ডিঙ্গাইয়া, সহর ডিঙ্গাইয়া সর্ব্বহারা কাঙ্গালের মত পৃথিবীর দুয়ারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

দৃষ্টি এম্‌নি করুণ।

অজয়া বলিল,—কি দেখ্‌লেন?

—দেখলাম ভুল করি নি। দেশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত...এমন একটা ক্ষেত্র নাই যেখানে খণ্ডগুলি একত্র হ'য়ে সংহতি লাভ করতে পারে। মুসলমানের দেশ নাই, কিন্তু ধর্ম্ম আছে; খৃষ্টানের ধর্ম্ম নাই, কিন্তু দেশ আছে; তারা তারই ওপর সঙ্ঘবদ্ধ। কিন্তু আমাদের না আছে ধর্ম্মের ক্ষেত্র, না আছে দেশপ্রীতি—তাই আমরা শতধা বিচ্ছিন্ন; আর প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন অংশ ব্যাধি আর দৈন্যের জঠরে জীর্ণ হচ্ছে।...কাজে লাগলাম; কিন্তু ব্যথা দু'হাতে কাজের দিকে ঠেল্‌তে থাক্‌লেও শ্রান্তি আসবেই; তখনই মনে হ'ত গৃহের কথা। আমার গৃহ নেই, কিন্তু গৃহেই মানুষের

বন্ধনদশা আর মুক্তি-সাধনা এক সঙ্গেই ঘটে; কর্ম্মের মাধুর্য্যের সেইখানেই বিকাশ; গৃহ থেকেই শ্রান্ত দেহ-মনকে সুস্থ করে' নিয়ে মানুষ আবার বাইরে আসে।...দেনা-পাওনার এই দাবি যার কাছে আসে না, সে হয় দেবতা না হয় পাষাণ।...মনের এম্‌নি আতুর অবসন্ন অবস্থায় আপনাদের সঙ্গে পাহাড়ে দেখা।

—আপনাদের দেশের বাড়ী?

—শূন্য। মন জুড়োবার স্থান সে নয়। বলিয়া সিদ্ধার্থ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।—

নিজের উপর সিদ্ধার্থর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধাও নাই; এইদিক দিয়া সে অত্যন্ত দুর্ব্বল।..এই সব অনুসন্ধানের অবতারণা যে কিসের সূত্রপাত, কোন্ দিকে ইহার লক্ষ্য, তাহা সে বুঝিয়াছে।...ভাই-বোনে কি কথা হইয়াছে, কিম্বা আদৌ হইয়াছে কি না তাহা সে জানে না; কিন্তু একটা গুরুতর ভাগ্য-বিপর্য্যয় যে আসন্ন তাহা নিঃসংশয়ে জানিয়া অন্তরের উদ্বেলিত উল্লাস পাছে ইহাদের সম্মুখেই তাহার মুখে চোখে উথলিয়া উঠিয়া তাহাকে বিপদে ফেলে এই ভয়েই সে যাই-যাই করিতেছিল।... এটা পরীক্ষাও বটে—

সিদ্ধার্থর হঠাৎ মনে হইল, তাহাকেই খুঁজিয়া খুঁজিয়া কে যেন জাল ফেলিয়া বেড়াইতেছে—

সুবিমল হ্রদে তার বাস, কি পঙ্ক-কুণ্ডে—

জালে জড়াইয়া উঠিলেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বলিল,—আজকের মত আমায় ছুটি দিন।

রজত বলিল,—দিলাম ছুটি। কিন্তু আমার চা মাটি করেছেন, ভুলে যাবেন না যেন।

সিদ্ধার্থ হাসিয়া বলিল,—আপনিও যেন ভুলে' যাবেন না, আমি আপনার চা মাটি করেছি। বলিয়া স্মিতমুখে উভয়কে নমস্কার করিয়া সিদ্ধার্থ বাহির হইয়া আসিল—

এবং রাস্তায় চলিতে চলিতে তার মনে হইতে লাগিল, যে সুপ্রভাতের প্রতীক্ষায় তার সর্ব্বংসহা প্রকৃতি এতদিন আহার-নিদ্রা-প্রীতি-গৃহ-বঞ্চিত হইয়াও একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়ে নাই, তাহারই আভাস যেন পথচারী প্রত্যেকটি নরনারীর মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।—

এদিকে যা' ঘটিতে লাগিল তাহাও সিদ্ধার্থ-সম্পর্কীয়।

অজয়া খানিক্ নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—দাদা—

বলিয়াই সে চুপ করিল; কিন্তু তার সলজ্জ সম্বোধনটি অর্থালঙ্কারে এমন সুসজ্জিত, আর এমন অনুরোধে প্রার্থনায় পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল যে, স্থূলদর্শী রজত তাহাতে কেবল বিস্মিতই হইল না, শব্দাতিরিক্ত অর্থটারই সে জবাব দিল; বলিল,—বুঝেছি; কিন্তু সব জিনিষেরই ত' নকল আছে, দিদি! সোনা যে এমন ধাতু তাকেও মানুষ নকল করে' চালাচ্ছে—ধরবার যো-টি নেই।

—তুমি কি বল্‌তে চাও সিদ্ধার্থবাবু নকল মানুষ!

—বল্‌তে চাইনে কিছুই; যাচাই করে' নিতে চাই।...

টাকাটা হাতে নিয়ে বাজিয়ে তবে পকেটে ফেলি ; যে তা' করে না সে ঠকে।···শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ বসু সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি !

শুনিয়া অজয়া আশ্চর্য্য নয়, হতাশ নয়, ক্ষুণ্ণ হইল ;—দাদার স্থূলদৃষ্টি কেবল স্থূলবস্তুর চাকৃচিক্য দেখে, তাহাকে অঙ্গুলির আঘাতে শূন্যে আবর্ত্তিত করিয়া সে সম্ভোগ করিতে চায়···আত্মার অনুভূতির নিগূঢ় সম্বন্ধ সে মানিতে জানে না—

বলিল,—পরিচয় ত' দিয়েছেন ; ভেতরকার মানুষটিকে ত' চিনেছ।

রজত ঘাড় নাড়িতে লাগিল,—চিনিনি। তাঁর কথা শুনেছি, গান গল্প বিলাপ শুনেছি, বক্তৃতা শুনেছি—এই পর্য্যন্ত ; কিন্তু মানুষ ত' কথার সমষ্টি নয়। আর, যে বেশী কথা বলে তার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়—যেন ধূলো উড়িয়ে সে আসল জিনিষটাকে ঢাকৃছে।

অজয়া হাসিল ; বলিল,—বাইরে তোমার চরিত্রের খ্যাতিটা কি রকম ?

—আমি কি বেশী কথা বলি ?···সেটা তোমার ভুল ধারণা। যাই হোক্, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলতেই পারে না ; পিসিমাকে ডাকৃতে হবে, অথবা সুরেনকে।

—এখনই তাঁদের ডেক' না ; একেবারে খবরটা দিও। বলিয়া অজয়া বাহির হইয়া গেল।

রজত চোখ বড় করিয়া মনে মনে বলিল,—বাপ্‌রে, একেবারে এতদূর !···

এবং দুর্ভাবনায় তার এমন অস্থির বোধ হইতে লাগিল যেন একটা অতিশয় দুরূহ আত্ম-বলিদানের দিকে তাহাকে কে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, কিন্তু যাইতে তার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই।—

সিদ্ধার্থকে রজত যে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহাতে সন্দেহই নাই; কিন্তু তার কারণটা ঠিক স্পষ্ট হইয়া ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নাই।...রজতের মনে হয়, যেদিক্ দিয়াই দেখা যাক্, সিদ্ধার্থর আত্মপ্রকাশ যেন অতিরঞ্জনে দূষিত; আর, একটা তীক্ষ্ণ চক্ষু এবং বক্রচঞ্চু অভিসন্ধি যেন সাবধানে ওৎ পাতিয়া আছে!

সিদ্ধার্থকে সে পরস্বলোলুপ মার্জ্জার বলিয়া মনে মনে গা'ল দিয়া ভাবিতে লাগিল—এখন উপায়? যে-রকম অজয়ার রকম, আর যে-রকম করিয়া "একেবারে খবরটা দিও" বলিয়া নির্ভয়ে গা-ঝাড়া দিয়া গেল তাহাতে যুক্তিতর্ক প্রভৃতি কোনো কাজে লাগিবে বলিয়া ভরসা নাই।...অথচ আপ্‌শোষ এই যে, ভবিষ্যতে ফল খারাপ দাঁড়াইয়া গেলে তাহাকেও ভুগিতে হইবে।...কাজেই রজতের মনে হইল, যাদের ভগিনী নাই তারা আছে ভাল।

(১২)

সিদ্ধার্থর চোখের সম্মুখে দিবারাত্র জল্ জল্ করে সন্ধ্যাকাশের যুগল তারকার মত অজয়ার চক্ষু দু'টি—

মূর্চ্ছাভঙ্গে চোখ মেলিয়াই সে দেখিয়াছিল, অজয়ার উৎকণ্ঠিত চক্ষু দু'টি যেন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তার চেতনাসঞ্চার নিরীক্ষণ করিতেছে—

চোখে চোখে মিলন হইয়াছিল—

অজয়ার চোখের অতলে ছিল একটা বিন্দুবাসিনী দ্যুতি—

তারপর সিদ্ধার্থ চোখ বুজিয়াছিল, দৌর্ব্বল্যবশতঃ নহে, পুলকে।…তার অবশ জিহ্বা জড়িতস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিল, আমি কোথায়? অজয়া—

কিন্তু আগাগোড়া তার অভিনয়…

সিদ্ধার্থ ভাবে, মূর্চ্ছা যাওয়া নিখুঁৎ হইয়াছিল, বেশ পড়িয়া-ছিলাম…

কিন্তু তার বিবেক যেন তপ্তস্পর্শে চম্‌কিয়া পিছাইয়া দাঁড়ায়…

দেবতার শুচি-শুভ্র মন্দির—সেখানে শুধু পুষ্পচন্দনের স্থান—

শোভা আর সৌরভ।…সিদ্ধার্থর মনে হয়, সেখানে সে পায়ের কাদা ছিটাইয়া দিয়া আসিয়াছে।

একে একে মনে পড়ে জীবনের কথা—

সে চোর, জারজ ; বেশ্যার দাসত্ব সে করিয়াছে।

যে-রত্ন আহরণ করিতে সে সিঁদকাঠি লইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার মত কুক্কুটের জন্য সে অপরূপ রত্নের সৃষ্টি হয় নাই।

জীবনের আরম্ভ মুদিখানায়—

তার পূর্ব্বে সে কোথায় ছিল কে জানে—

মুদিখানাটাই স্পষ্ট মনে পড়ে ; সেখানে সে মুদির ভৃত্য ছিল ; তামাক সাজিত, বাটখারা ধুইত ; সকালে সন্ধ্যায় ঘরে ধুনা আর চৌকাঠে জলের ছিটা দিত ; ঝগড়া বিদ্রোহ করিত…

আরো ভাল করিয়া মনে পড়ে, থিয়েটারের কথাটা—

মুদিখানা হইতে প্রোমোশন্ পাইয়া সে সখের থিয়েটারে আসে—একটি বাবুর অনুগ্রহে। তাহার কণ্ঠের সুরসম্বলিত শ্রীমতীর বিরহ-সঙ্গীত শুনিয়া ম্যানেজারবাবু তাহাকে মুদির নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যান।

মফঃস্বলের থিয়েটার—

রাজকন্যার সখী সাজিয়া তাহাকে ঘাগ্‌রা ঘুরাইয়া নাচিতে হইত ; এবং প্রণয়াস্পদের জন্য ব্যাকুলা নায়িকাকে নাকিসুরে প্রবোধ দিতে হইত, সখি, ভেব'না ; সে আস্‌বে, আস্‌বে, আস্‌বে।…

থিয়েটারের লোকগুলি নিজেদের গরজেই তাহার একটি

মহদুপকার করিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার উচ্চারণে গ্রাম্যদোষ থাকিত ; এবং সেই ত্রুটিসংশোধনের জন্য, অর্থাৎ ফুল্লকে যাহাতে ফুল্লো আর সে না বলে সেই জন্যই তাহাকে একটু 'তৈরী' করিয়া লইতে একখানি বর্ণপরিচয় কিনিয়া দিয়া তাহাকে পাঠ দিতে লাগিয়া গেল—

মেধা ছিল, আগ্রহও ছিল—

খুসী হইয়া ম্যানেজারবাবু তাহাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

লেখা-পড়ায় উন্নতি হইল ঢের, কিন্তু মনের ইতরতা ঘুচিল না—

অর্থলোভে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার…

সিদ্ধার্থ এইখানে ব্যথায় মুখ বিকৃত করিয়া উঃ বলিয়া একটা আর্ত্তনাদই করিল—

সেই নরক !

…তারপর সেই বৃদ্ধাকে হাসপাতালের ডোমের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাহারই পরিত্যক্ত অর্থ মূলধন করিয়া সে সুরু করিল ব্যবসা—

পাপের কড়ি প্রায়শ্চিত্তে গেল—

নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত হইয়া সে হাটের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল…

দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে সাক্ষাৎ হইয়া গেল সেই আসল সিদ্ধার্থ বসুর সঙ্গে।

* * * সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ আর্ত্তরক্ষায় একদিন জীবন দান করিল তাহারই চোখের সম্মুখে…

এখন তাহারই লাঠি আর নাম গ্রহণ করিয়া তাহারই কথা উচ্চারণ করিয়া সে বেড়াইতেছে; সিদ্ধার্থর ব্রতপরিচয় সহ জীবনের আদ্যন্ত কথা নটবরের জীবনকথায় রূপান্তরিত হইয়া গেছে।...তারি ভূমিকা অভিনয় করিয়া সে মুগ্ধ করিয়াছে একটি নারীকে—

আর একবার আর একটি নারীকে সে মুগ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তখন প্রাণ জুড়ায় নাই...সেই ক্ষিপ্ততার স্মৃতি এখন কটু হইয়া উঠিয়াছে—

ভগবান রক্ষা করিয়াছিলেন—

মহাপাতকের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

কিন্তু আজ অবৈধতার বাধা নাই—

সে আজ বৈকুণ্ঠের অধিবাসী...

মন খোলসা হইয়া সিদ্ধার্থ ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতে লাগিল...

মনে হইল, পৃথিবীর স্পর্শপ্রভাবের সে অতীত—

মূর্চ্ছাভঙ্গে অজয়ার চোখে যে নির্ণিমেষ চাহনিটা দেখিয়াছিল, সিদ্ধার্থর মনে হইল, সেই চাহনির ভিতরেই অনঙ্গ দেবতার অরুণ নেত্র ফুটিয়া ছিল, এবং তাহারই রক্তরশ্মি যেন তাহাকে রথে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ...

এই পৃথিবীর সাধারণ লোকের মত নিজেকে এতক্ষণ অতিশয় বিবেক-বিব্রত মনে করায় সিদ্ধার্থ মনে মনে খুব হাসিতেছে এমন সময় তাহার বন্ধ দুয়ারের উপর ভীষণ শব্দে করাঘাত পড়িল।

—কে ?

প্রশ্নটা যেন একটা ঝটিকাবর্ত্ত—

এমনি করিয়া সে সিদ্ধার্থর সুখের চূর্ণ প্রাসাদটিকে মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাহির হইতে আওয়াজ আসিল,—পাওনাদার।

সিদ্ধার্থর কানের ভিতর ঝম্ ঝম্ করিতেছিল ; বলিল,—ভেতরে আসুন।

আসিল রাসবিহারী—

এবং আসিয়াই খল্‌খল করিয়া হাসিতে লাগিল ; বলিল,—আমি গো, মাত্তর রাসবিহারী ; তোমার বন্ধু আর অনুগ্রহপ্রার্থী।

কিন্তু সিদ্ধার্থর মনে হইল, তাহার বন্ধু এবং অনুগ্রহপ্রার্থী রাসবিহারী বর্ষায় বিদ্ধ করিয়া তাহাকে তাহার নিজের বায়ু আকাশ হইতে নামাইয়া, যেখানে সে বাঁচিতে পারে না, সেই উষ্ণ বাষ্পের ভিতর টানিয়া আনিয়াছে।

সিদ্ধার্থ কথা কহে না দেখিয়া রাসবিহারী বলিল,—বুকের ধড়ফড়ানি থামেনি এখনো ? দেবরাজও আস্‌ছে—

সিদ্ধার্থ বলিল,—সেদিন তোমায় আমি অপমান করেই বিদায় করেছিলাম। তুমি রাগ করেও আমায় ত্যাগ করছ না কেন, রাসবিহারী ?

—কম্‌লি, কম্‌লি—সে কি অল্পে ছাড়ে ? সেদিন বড় দুঃখিত মনেই ফিরেছিলাম ; কিন্তু তুমি যে আমার পুরাতন বন্ধু, ভাই !

তোমায় কি আমি একটি দিনের একটি কথায় ত্যাগ করতে পারি?

দেবরাজ রাসবিহারীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বলিল—যে জন্যে আসা সে কথাটা—

—বল্‌ছি, আগে বসি।

রাসবিহারী বসিয়া বলিতে লাগিল,—মামলা রুজু করতে চাই, সিদ্ধার্থবাবু। এখন তোমার সহৃদয় অনুমতি পেলেই শুভ দেখে একটা দিন ঠিক্ করে' ফেলি।

—আমি যদি জালখতের টাকা দিতে অঙ্গীকার করি—

শুনিয়া রাসবিহারীর চোখ কপালে উঠিয়া গেল না—একটু বড় হইল; বলিল,—একমিনিট সময় দাও!···সেদিন ভেবেছিলাম তোমার মন খারাপ; এখন দেখছি, তোমার মন ওলট-পালট হ'য়ে গেছে। সিদ্ধার্থবাবু, তুমি বল্‌ছ কি!

—বলছি এই, যদি টাকাটা দিয়ে দিতে অঙ্গীকার করি, তা'হলে তাকে ক্ষমা করবে?

—কাকে?

—যার সর্ব্বনাশ করবে বলে কোমর বেঁধেছ।

—সর্ব্বনাশ করবো বলে' কোমর বেঁধেছি যদি জানো তবে টাকা দেখাচ্ছ কেন? টাকা আমার ঢের আছে—ব'য়ে ব'য়ে টাক পড়ে গেছে।...আর তুমি যে টাকার কথা শোনাচ্ছ' সে-টাকা কাকে রাজা করে দিয়ে বখ্‌শিস পেয়েছ, শুনি?

দেবরাজ বলিল,—সুর এক লম্ফেই যে সপ্তমে চ'ড়ে গেল!

সিদ্ধার্থর কাতর মুখ দেখিয়া তাহার মমতা জন্মিয়াছিল।... কিন্তু রাসবিহারী মর্ম্মাহত হইয়া গলা চড়াইয়া দিল,—দেখো লোকটার কৃতঘ্নতা।...তারপর সে সিদ্ধার্থর দিকে ফিরিল,—অনাহারে শুকিয়ে যখন মরছিলে তখন ধর্ম্ম তোমায় রাখেনি, ধর্ম্মাবতার; এই পাপাত্মার অধর্ম্মের পয়সাই তখন তোমায় বাঁচিয়েছিল।

—নিজের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে।...তবু সেই দানের জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ; কিন্তু কৃতজ্ঞতা ছাড়া মনের আরো অনেক বৃত্তি আছে যা' আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

রাসবিহারী ঘাড় বাঁকাইল,—চাইনে বুঝতে। যা' পারো তাই তোমায় করতে বল্‌ছি।

সিদ্ধার্থর প্রাণ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল—

সে কায়মনোবাক্যে সংশোধিত হইয়া খোলস্ ছাড়িতে চায়, সেই ক্ষণটি তার এখন উপস্থিত—যে-ক্ষণটি মানুষের জীবনে বিদ্যুতের মত একবার চকিতে দেখা দেয়· তাহারই আলোক যে ধরিয়া রাখিতে পারে জীবনে তার অলোর অভাব ঘটে না; কিন্তু তাহার সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে দুষ্কৃতির সূত্রে আর স্মৃতিতে আরো বহু লোক, আর এই রাসবিহারী...

স্মৃতিকে সে সরাইয়া রাখিয়াছে—

অনুভূতির পরিধি তার সুসংস্কৃত হইয়া ব্যাপক হইয়া গেছে—

কেবল রাসবিহারীই পুনঃপুনঃ দেখা দিয়া তাহাকে মনে করাইয়া দিতেছে যে, পৃথিবীর কোনো রূপান্তর ঘটে নাই—

কণ্টকবনের পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ পথে সে সেই মানুষই আছে...

সিদ্ধার্থ হঠাৎ যেন অজ্ঞান হইয়া গেল—

হেঁট হইয়া রাসবিহারীর পা সে ছুঁইয়া ফেলিল; বলিল,—তোমার পায়ে ধরে কিছুদিনের সময় চাইছি; অন্ততঃ দু'টি মাস আর অপেক্ষা করো।

রাসবিহারী সিদ্ধার্থর হাতের নাগালের বাহিরে সরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু রাগে তার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতেছিল; বলিল,—না হয় করা গেল, কিন্তু তার পরে?

—ঋণ পরিশোধ করবো।

—কিন্তু ঋণ পরিশোধের তাগিদ এ ত' নয়।

—নয় নয়, তা-ই। কৃতজ্ঞতার ঋণ। ঐ কথাটা শোনাতে না পারলে সাধ্য কি তোমার যে আমার গলায় হাত দাও!... সময় দিলে ত?

—দিলাম, বড় অনিচ্ছার সঙ্গেই দিলাম। কিন্তু উড়ো না যেন। একবার কিছুদিন তোমায় খুঁজে পাইনি।

—আমার ঐ সঙ্কোচটুকু আছে বলেই টাকা তোমার নিরাপদ, তা' তুমি জানো।

—জানি।...একটা কথা মনে রাখ্‌তে তোমায় বলে যাই; কলিতে ধর্ম্ম নাই; নিজের কাজ বাজিয়ে নাও—এই কলির একমাত্র ধর্ম্ম।—

রাসবিহারীরা চলিয়া গেলে সিদ্ধার্থ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই

ভাবিতে পারিল না—ভাবনা যেন দানাই বাঁধিল না।...তারপর অল্পে অল্পে কাজ সুরু হইল—রাসবিহারীর সদুপদেশটা সে ভাবিয়া দেখিল, এবং বুঝিল ঠিকই।...শূন্য উদরে ধর্ম্মের জয়ঢাক বাজাইয়া বেড়ান নির্ব্বোধের কাজ, আত্মঘাতীর কাজ; আত্ম-প্রবঞ্চনা করিবারও অধিকার কাহারো নাই—তাহারও নাই।... কে কবে পরের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের প্রাপ্য কপর্দ্দক ত্যাগ করিয়াছে!... কথকের মুখে শোনা গেছে, শত্রুভাবেও ভগবানকে লাভ করা যায়; সে-ও অধর্ম্ম; তবে অধর্ম্ম ঘৃণ্য কিসে?...ভগবানকে সে চায় না—সে চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে...একটি সুমধুর সুস্থ নারীহৃদয় জয় ক'রে সেখানে নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন স্থাপিত করতে।...রাসবিহারীই যথার্থ বন্ধু...দৃষ্টান্ত দেখাইয়া একটি কথায় বিবেকের বিদ্রোহ দমন করিয়া দিয়া গেছে।...

সুতরাং রাসবিহারীর ঋণ সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।—

দু' দশমিনিট পূর্ব্বেই যে রাসবিহারীকে সিদ্ধার্থ পরম শত্রু ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে নাই, সে-ই এখন তার পরম মিত্র হইয়া উঠিল—

মানুষ কেবল নিজের ব্যগ্রতায় ডিগ্‌বাজি খাইয়া চলিয়াছে—
কিন্তু সে তা' জানে না—
মনে করে, পৃথিবীরই রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—
বিস্ময়ে সে অবাক্ হইয়া যায়।—

---

(১৩)

স্বীয় কর্ত্তব্যতা বিষয়ে দিশা না পাইয়া রজত তাহার পিসিমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

আলোচনা বৈঠকে বসিয়া রজত প্রথমেই বলিল,—পাহাড়ে বাঘ ভালুক আছে—সুখে থাক্ তারা, মানুষের সাম্‌নে এসে পড়লে তারাও বিপদ গণে, তাদের ওপর গুলি চালানো যায়; আর একটা মস্ত সুবিধে, তারা এসে জাঁকিয়ে বসে' আত্মকাহিনী মুখস্থ বলে না; যারা তা' বলে তাদের ওপর গুলি চালানো যায় না, এ-হিসাবে বাঘ ভালুকই বেশী নিরাপদ দেখ্‌ছি।...কি করা যায়, পিসিমা?

বিমলের মা বলিলেন,—যা-ই করো, গুলি চালালে গোল মিট্‌বে না।

—আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছে। অজয়ার সুখের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে ব্যাপার বড় জটিল হ'য়েই উঠেছে।...যে আকর্ষণের প্রভাবের মধ্যে গিয়ে সে পড়েছে, সেখান থেকে টেনে আন্‌লে সে ছিঁড়ে আস্‌বে।

—এতদূর এগিয়ে গেছে ?

—সম্ভবতঃ এক নিমেষেই, প্রথম দর্শনেই।

ঐ 'প্রথম দর্শন' কথাটা পিসিমার বড় বিস্বাদ লাগিল।... তাঁহার বিবাহের প্রাক্কালে বরপক্ষীয় প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পক্ষের এক গুরুজন যাইয়া পাত্রকে একেবারেই আশীর্ব্বাদ করিয়া কথা পাকা করিয়া আসিয়াছিলেন।...তাঁহাদের "প্রথম দর্শন" ঘটিয়াছিল শুভদৃষ্টির সময়...কিন্তু তখন যে কি ঘটিয়াছিল তাহা তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই।...শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠানটি বিবাহের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া হইয়াছিল নিশ্চয়ই—এইরূপ একটা অ-স্বচ্ছ ধারণা তাঁর আছে।—

কাজেই প্রথম দর্শনেই মূল হইতে ডগা পর্য্যন্ত প্রেমে পড়িবার দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে দেখিয়া তিনি মনে মনে চটিয়া গেলেন; ভাবিলেন, সবই বাড়াবাড়ি; শিক্ষাপ্রাপ্তা বলিয়া আধুনিক সুন্দরীরা যত আড়ম্বরই করুক, হৃদয় সম্পর্কে সেই আদি নারীর চাইতে তিলমাত্র উন্নতি তাদের হয় নাই; একবার টলিলেই গড়াইতে সুরু করিয়া দিবে; বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়া এমন হুঁস্‌টুকু রহিবে না যে, গড়াইয়া সে রসাতলেও পড়িতে পারে।

প্রকাশ্যে বলিলেন,—অজয়াকে বুঝিয়ে বলেছ?

—কে? আমি? তর্কে আমি তার সঙ্গে কোনোদিন পারিনে। আর, বোঝাবই বা কি!...তারপর দেখো দৈবের সূক্ষ্ম গতি... ক্রমশঃ দেখা গেল, দু'জনার আশ্চর্য্য রকম মতের মিল,

দেশোদ্ধারের পতিতপাবনী নেশা।...তারপর চূড়ান্ত হ'য়ে গেল মূর্চ্ছায়।

—কি রকম?

—চা খেয়ে তিনজনে চলে' আস্‌ছি—আগে আমি, তারপরে অজয়া, সকলের পিছনে সিদ্ধার্থবাবু। দু' একপা এসেই সিদ্ধার্থবাবু ছিন্নমূল কদলীকাণ্ডের মত হুড়্‌মুড় করে' পড়ে' গেলেন।... যখন তাঁর জ্ঞান হ'ল তখন তিনি চোখ্ মেলেই বল্‌লেন,—আমি কোথায়? অজয়া...বলেই তিনি এমন ভাবে চোখ্ বুজে' ফেল্‌লেন যেন তাঁর বুকের বোঝা নেমে গেছে।

শুনিয়া পিসিমার মনে, রজতের কথার বক্রস্থরের সূত্র ধরিয়া, আশ্চর্য্য একটা অন্তর্দৃষ্টির উদয় হইয়া গেল; বলিলেন,—ঐ মূর্চ্ছার ব্যাপারটা আমার সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, রজত।...তার পরই মনের আর অন্তরাল রইল না।...যদি মূর্চ্ছা ভাণ হয় তবে সে ধূর্ত্ত বটে।

—ভাণ না হ'য়ে যায় না...কোথাও কিছু নেই, পরিষ্কার সুস্থ মানুষ, বারাণসীর ষাঁড়ের মত ষণ্ডা বপুখানা; তার মূর্চ্ছা কি খাম-খাই হয়!...মানে এই যে, জ্ঞান হ'য়েই ধোঁয়াটে মাথায় তোমার নামটি সর্ব্বাগ্রে এসেছে, অতএব জানো যে, আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত; তোমার দাদাও অকুস্থলে উপস্থিত—তাঁকেও সে-খবরটা এই সঙ্গেই দিয়ে গেলাম; আপত্তি থাকে ত, সেটাও স্পষ্ট করে' জানাবারও এই-ই সুযোগ।...

পিসিমা খানিক ভাবিয়া বলিলেন,—প্রথমতঃ অর্থ ঐ; দ্বিতীয়

অর্থ, সে যথার্থ ভালবাসে না; বাসলেও, যে কারণেই হোক্, নিজেকে সে অযোগ্য মনে করে; অথবা তুনিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় ডুবে ডুবে; কাজেই মুখোমুখী নিজেকে স্পষ্ট করে' তোল্‌বার সাহস তার নেই।...কিন্তু একথাও বলতে হবে, তার মূর্চ্ছা ভাণ বলে' আমরা অনুমান করে' নিয়েছি।...যদি লোক ভাল হ'ত—

অজয়া আসিয়া দাঁড়াইল—

কথোপকথনের কতটা তার কানে গিয়াছে তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু তার মুখখানা যেন থম্ থম্ করিতেছিল; সেই দিকে চাহিয়া মন্ত্রণাসভার উভয় সদস্যই থম্‌কিয়া গেলেন।—মুখে বলা না হইলেও, পিসিমা ও রজত তু'জনেই মনে মনে জানিতেন যে, তাঁহাদের এই কথাবার্ত্তা গোপন কথাই।...অজয়াকে লুকাইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পরে তাহাকে অনুরোধ করিয়া নিরস্ত করিতে হইবে, অথবা সম্মতি দিয়া উৎসবে ব্যাপৃত হইতে হইবে।...কিন্তু একটা অনুমানকে ভিত্তি করিয়া এতবড় সত্যকার গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিতে যাওয়া যে শুধু অশোভন নয় অসঙ্গতও, সেই কথাটাই অজয়াকে দেখিয়া তাঁহাদের মনে পড়িয়া গেল।

অজয়া বলিল,—পিসিমা, রায় ত' দিয়ে বস্‌লে; কিন্তু তার আগে অপর পক্ষের বক্তব্যটা তোমাদের শোনা উচিত ছিল; বিচারে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটছে যে!

কিন্তু পিসিমা মেয়েমানুষ—

কথার মোড় ঘুরাইয়া লইয়া মেয়েলি ছন্দেই তিনি বলিলেন,—শোনো মেয়ের কথা! আমরা কি তোমার শত্রু? তোমারই সুখ আমাদের দেখ্‌বার জিনিষ—তা' ছাড়া আমরা আর কিছুই ভাব্‌ছিনে; কিন্তু তাই বলে' সামাজিক সম্মানের দিকটাও না ভাবলে ত' চলবে না। বলিয়া পিসিমা যেন ভাবনার উত্তাপেই হাল্কা হইয়া মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে লাগিলেন।

—কিন্তু এত ভাবনা তোমাদের আমায় লুকিয়ে কেন?

লুকানটা ঠিক এই ক্ষেত্রে হীনতা না হোক্ দুর্ব্বলতা নিশ্চয়ই—তাহা রজত বেশ জানে; বলিয়া উঠিল,—তুমি এ কথার মধ্যে এসো না। বিষয়টি বড় জটিল—

—বিপদসঙ্কুল নয়?

—বিপদসঙ্কুল বৈ কি; এ যে জীবন-মরণ সমস্যা; একদিকে তোমার চিরসুখ, সার্থকতা; অন্য দিকে—

—থাম্‌লে যে?

—কি আর বলি বলো!

কিন্তু পিসিমার বলিবার কিছু ছিল; বলিলেন,—আমাদের আগেকার অনুমানগুলি যদি নির্ভুল হয় তবে, অজয়া, রাগ করো না, সে লোক ভাল নয়।

অনুমান!

ক্রোধে অজয়ার মন দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল; বলিল,—পিসিমা, তুমি জানো যে তোমরা যে অপরাধ করছো এখন, তা' আমি সইতে পারিনে। তোমাদের অনুমানগুলি কি তা' আমি

জানিনে, কিন্তু যাঁকে তোমরা অনুমানে বিচার করতে বসেছ তিনি এখানে উপস্থিত নেই ; শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে অনুপস্থিত একটি লোককে অমানুষ সাব্যস্ত করা ঠিক সামাজিক ব্যবহার নয়।

কিন্তু অনুমান ছাড়া উপায় কি?···চক্ষুলজ্জা আছে যে··· তারপর, অনুমানকে একেবারে অকেজো মনে করিলে মানুষের বার আনা কাজের যে সূত্রপাতই হয় না। কিন্তু রজত এই কথাগুলি প্রকাশ্যে না বলিয়া বলিল,—এমন কতকগুলি অনুমান আছে যা' প্রত্যক্ষবৎ সত্য হ'তে বাধ্য। নাড়ী দেখে' জ্বর আছে কি নেই বলাটাও বৈদ্যের অনুমান। কিন্তু—

—তর্ক করতে আমি চাইনে; কিন্তু এটাও তোমাদের সাম্‌নেই আমি বলে' যাচ্ছি যে, আমিও তোমাদের চেয়ে অনুমানে কম পটু নই। বলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—মানুষ দেবতা নয়, তাই তার দোষের ভাগটাও ব্যাখ্যার পাণ্ডিত্যে গুণ হ'য়ে দাঁড়ায় না ; আর খাঁটি মানুষ কেবল অনুমানের টানে নেমে অবাঞ্ছনীয় হ'য়ে ওঠে না।...বৈদ্য অনুমান করেন জ্বর থাকা না থাকা—মানব-চরিত্র নয়।

অজয়া চলিয়া গেলে সদস্যদ্বয় পরস্পরের দিকে খানিক অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন—

উভয়েরই কর্ত্তৃত্ববোধ ধাক্কা খাইয়া মুখ মলিন করিলেও ন্যায়-বোধটা চোখ মেলিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল—

কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য।

অজয়া যদি তাহাদের পন্থাকে অন্যায় এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিচার মনে করিয়া থাকে তা' করুক...

রজত পা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

বলিল—থাম্‌লে চল্‌বে না, পিসিমা; দায়িত্ব যে সর্ব্বথা আমাদের!...আমি একবার ঘুরে' আসি সেই হেমন্তপুর আর লাহোর।—

পিসিমা বলিলেন—আমিও ইত্যবসরে একবার দেখে নিই সেই অদ্বিতীয় লোকটিকে।

(১৪)

রজত হেমন্তপুর অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিস্তর ক্লেশ পাইয়া যখন সে হেমন্তপুর গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন সেখানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতেছে।

সাধুচরণ দাস গ্রামের দক্ষিণপাড়ার দলপতি—

এবং তাহার গৃহে যাহারা সমবেত হইয়াছে তাহারা তাহারই অনুগত।...একটি মাম্‌লা সাজান হইবে, তাহারই মহলা চলিতেছে।

উত্তর পাড়ার ছমির সেখ তাহাদের লক্ষ্য—

সাক্ষী তালিম দিয়া সাধুচরণ সুখ পাইয়াছে...সবাই প্রস্তুত... জেরার প্রত্যুত্তরে কি বলিতে হইবে তা' পর্য্যন্ত সাধুচরণের শিক্ষায় সাক্ষীগণের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে...

এমন সময় হামিদ হঠাৎ কি যে বলিয়া বসিল তাহার মাথামুণ্ডু কিছুই নাই; শুনিয়া সাধুচরণ হাসিবে কি কাঁদিবে তাহাই ঠিক করিতে পারিল না।—

হামিদ বলিল,—আমায় মাপ করো, দাসমশাই; আমি পারবো না; দারোগা ধমক দিলেই আমার সব গুলিয়ে যাবে;

শেষে কি উল্টো ফ্যাসাদে পড়্‌বো? বলিয়া হামিদ এখনই যেন ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়িতে লাগিল –

কিন্তু সাধুচরণের হামিদকেও চাই।—

খানিক সে অবাক্ হইয়া হামিদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল —যেন হামিদ্ যে এমন কথা বলিতে পারে তাহার স্বকর্ণে শুনিয়াও সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; তারপর সে রাগিয়া উঠিল; বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,—দারোগা ধমক্ দেবে আমি থাক্‌তে! হামিদ তুই বল্‌ছিস্ কি! হুঁঃ, আশু বিশ্বেস আবার দারোগা—তাকে আবার ভয়!… আরশোলাও পাখী, আশু বিশ্বেসও দারোগা!…কত বড় বড় জাঁদরেল দারোগা, যার চোখ দেখ্‌লে তোরা কুঁক্‌ড়ে আধখানা হ'য়ে যাবি, লাট্‌সাহেবের খাস্ দারোগা—তাদের পর্য্যন্ত আমি এই—

বলিয়া লাট্‌সাহেবের খাস্ দারোগাগুলিকে একত্র করিয়া সাধু ট্যাঁকে গুঁজিতে যাইতেছিল, এমন সময় স্থানাভাবে নহে, অন্য কারণে কাজটা তার শেষ করা হইল না।

…সাধুচরণের ছোট ছেলেটা কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিয়া গেল,—বাবা, দারোগা। বলিয়াই সে পোঁ করিয়া সিটি বাজাইয়া যেন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

—এ্যাঁ, দারোগা? কোথায় দেখ্‌লি?

কিন্তু ছেলে তখন বহুদূরে; লাট্‌সাহেবের খাস্‌দারোগা-গ্রাসকারীর ত্রাস দেখিবার জন্য সে দাঁড়াইয়া নাই।

—নিতাই দেখ্‌তো এগিয়ে কে।

কিন্তু নিতাই দেখিতে সুপুরুষ হইলেও ভিতরে কাপুরুষ; এতগুলি লোক উপস্থিত থাকিতে স্বয়ং তাহাকেই অগ্রসর হইতে বলায় সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল; বলিল,—আমি একা যাবো?

কাপুরুষতা সাধুচরণের একেবারে অসহ্য; ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, —এ কি বুনো শুয়োর মারতে যাচ্ছো যে লোক লস্কর হাতিয়ার সঙ্গে না নিলে ফেঁড়ে ফেল্‌বে? যা এবুফান, নিতাইয়ের সঙ্গে যা।—

সাধুর মন নক্ষত্রবেগে একবার ঘুরিয়া আসিল—কিন্তু দারোগার সরজামিনে এই গ্রামে আসিবার কোনো কারণই সে দেখিতে পাইল না।

—দারোগা নাকি সত্যি?

নিতাই বলিল,—না বোধ হয়, সঙ্গে সেপাই নেই; একা একাই আস্‌ছে; পেণ্টুলান পরা আছে, টুপী আছে মাথায়।

—তবু সাবধানের মা'র নেই; তোরা একটু ওদিক্ পানে সরে' থাক্।

নিতাই সরিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল,—ট্যাঁক্ খালি আছে ত, দাসমশাই?—

কিন্তু যে আসিল সে দারোগা নয়।

—সাধুচরণ দাস কার নাম? বলিয়া রজত আসিয়া দাঁড়াইল।

সাধুচরণ বলিল,—আজ্ঞে, আমারই নাম সাধুচরণ দাস, আপনার দাসানুদাস।

সাধুচরণ মাথা চুল্‌কাইতেছিল—

সেইদিকে চাহিয়া রজত বলিল,—তুমিই এ-গাঁয়ের বর্দ্ধিষ্ণু লোক, তাই শুনে' তোমার কাছেই এলাম।

—হুজুরের অনুগ্রহ। হুজুর বস্‌লে' কৃতার্থ হ'তাম। বলিয়া জলচৌকিখানা কোঁচার খুঁট দিয়া পরিপাটি করিয়া মুছিয়া দিল।

রজত বসিয়া বলিল,—তুমি চিরকাল এই গাঁয়েই বাস করছ?

—হুজুরের আশীর্ব্বাদে এই গাঁয়েই বার চোদ্দ পুরুষের বাস; আমিও এই গাঁয়েই চিরকাল আছি; গাঁ ছেড়ে' একপা-ও কোথাও যাইনি' কোনো দিন।

সাধুচরণের বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্‌ করিতেই লাগিল।... কোনো বিশেষ দিনে এই গ্রামে থাকাটা ঠিক্‌ উচিত কিনা তাহা জানা নাই, প্রশ্ন করিয়া পেণ্টুলানধারী কোন্‌ ঘটনার সংস্রবে কি জানিতে চাহিতেছে...আর, গ্রামে পুরুষানুক্রমে থাকারই বা কি ফলাফল দাঁড়াইতে পারে!...

জিজ্ঞাসা করিল,—হুজুর বুঝি আমাদের মহকুমার নতুন হাকিম? বলিয়া হাত জুড়িয়া রহিল।

রজত হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—হাকিম টাকিম আমি নই; তোমাদেরই মত সাধারণ একজন।

শুনিয়া সাধুচরণের উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইল—

এবং ওদিক হইতে নিতাই প্রভৃতি একে একে নির্গত হইয়া দেখা দিল। রজত তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—এ গ্রামে ত্রৈলোক্য বসু নামে কেউ বাস কর্‌তেন বলে' তোমার মনে পড়ে?

—পড়্‌বে না কেন, বাবু, খুব পড়ে।···নিতাই, তোরা বোধ হয় জানিস্‌নে, গ্রামের উত্তর সীমানায় তাঁদের বাড়ী ছিল। কিন্তু সে বাড়ীতে ত' কেউ নেই বাবু, এখন; চারটে ভিটে পড়ে' আছে।···আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন তাঁরা। স্বামী-স্ত্রীতে থাকৃত—এই মহাদেবের মত দেহ; তাঁর স্ত্রীও ছিল তেম্‌নি ভগবতীর মত সুশ্রী।

—কোথায় গেছেন তাঁরা? সন্তানাদি কিছু ছিল তাঁদের?

—না, মনে ত' পড়ে না; উঁহু, ছিল না।···আমি তখন ছোট—তের চোদ্দ বছরের; তখন শুনেছিলাম, পশ্চিম মুলুকে কোথায় বড় চাকৃরী পেয়ে যাচ্ছে।··বাবু বুঝি তাঁদের কেউ আপনার লোক?

—না; তবে তাঁদের ছেলের সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ পরিচয় হয়েছে।···গ্রামের জমিদার কে?

—জমিদারের কথা আর সুদোবেন না, বাবু।···একটিবার চোখে দেখ্‌তে পেলাম না তাঁর চেহারাখানা কি রকম। তিনি বারমাস ক'লকাতাতেই থাকেন; এখানে নায়েব গোমস্তারা থাকে, হাঙ্গাম-হুজ্জৎ যা' করবার তা' তারাই করে।

রজতের মনে হইল, সিদ্ধার্থবাবু নিজের গ্রামে কখনো পদার্পণ করেন নাই দেখিতেছি—

সেই সম্পর্কে দু'টি একটি প্রশ্ন চলিতে পারে—

কিন্তু আর বেশী সময় নাই; বলিল,—তবে এখন উঠি, সাধুচরণ। পাঁচ মাইল হেঁটে আবার গাড়ী ধরতে হবে। বলিয়া পকেটে হাত দিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রজত সহরের মানুষ—

কাজ করাইয়া লইয়া পয়সা দেওয়ার অভ্যাস আছে; কিন্তু সাধুচরণের লওয়ার অভ্যাস নাই।...টাকাটা রজত দিতে গেলেই সাধুচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল—টাকা কেন, বাবু!

—তোমাদের কষ্ট দিলাম, মিষ্টি খেও।

—না, বাবু, দু'টো কথা কয়ে মিষ্টি খেতে টাকা আমি নিতে পারবো না—আপনি ও রাখুন। বরঞ্চ যদি অনুমতি করেন ত' একটা কথা বলি...

এবং অনুমতির জন্য সময়ক্ষেপ না করিয়াই সে বলিতে লাগিল,—আপনার আহারাদির জোগাড় ক'রে, দিই; এ-বেলা স্বপাকে সেবা ক'রে ও-বেলা গাড়ী ধরবেন।

—এ-যাত্রা আর সে-সুবিধে হ'ল না, সাধুচরণ। আবার যদি আসি তবে খেয়ে যাব, তবে স্বপাকে নয়, তোমাদের পাকেই।... আর জমিদার যাতে গাঁয়ে আসেন তার বন্দোবস্ত ত্রৈলোক্যবাবুর ছেলেকে দিয়ে করিয়ে দেব।

...টাকাটা পকেটে ফেলিয়া রজত পুনর্যাত্রা করিল।

(১৮)

…লাহোর হইতে রজত ফিরিয়াছে।

বলিতেছিল—সিদ্ধার্থবাবু যা' যা' বলেছেন তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়, পিসিমা। হেমন্তপুরে তাঁদের ভিটে পড়ে' আছে; লাহোরে তাঁর পিতৃবন্ধু অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে…তাঁরা এক একজন দিক্পাল লোক। তাঁরা সবাই ত্রৈলোক্যবাবুর অকালমৃত্যু স্মরণ করে' তাঁর অশেষ গুণগান আর সিদ্ধার্থবাবুর জন্য অত্যন্ত আক্ষেপ করে' বল্লেন,—অমন গুণবান্ ছেলে দুটি দেখা যায় না। কিন্তু একটি মহাদোষ তাঁদের সমুদয় আশা আর সিদ্ধার্থ-বাবুর জীবন মাটি করে' দিয়েছে।

—কি মহাদোষ?

—নিজের স্বার্থ চিন্তা না করা। যতদিন তাঁদের মধ্যে সিদ্ধার্থবাবু ছিলেন, ততদিন একা একা বিষণ্নমুখে সর্ব্বদাই কি ভাবতেন; ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন তিনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে যান। তখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত।…আমার মুখে তাঁর কুশলসংবাদ পেয়ে সকলেই মহা আহ্লাদিত হলেন।…এখন তোমার পরীক্ষার ফল কি বলো।

পিসিমা হঠাৎ একটু হাসিলেন—

বলিলেন,—প্রথম যেদিন দেখা হ'ল সেদিন আমি একা ছিলাম।...সিদ্ধার্থ ঘরে ঢুকতেই আমার চোখে পড়ল তার চোরের দৃষ্টি।

—চোরের দৃষ্টি? মানে?

অভ্যস্ত চতুর দৃষ্টি—যা' একপলকেই দেখে নেয়, কোথায় কোন জিনিষটা রাখা আছে, কোনটা ভারি, কোনটা হাল্‌কা—প্রত্যেকটির মূল্য কত!

প্রথমটা চম্‌কিয়া উঠিলেও রজত ইহার একটি অক্ষরও বিশ্বাস করিল না।

...নৃচরিত্রে এই সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশ আদৌ সম্ভব নহে···পিসিমা নিজের কষ্ট-কল্পনাকে সাজাইয়া একটা চমকপ্রদ আকার দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। রজত মনে মনে একটু হাসিয়া তাঁহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিল।···সিদ্ধার্থ দরিদ্র বটে, পিতার দানাতিরিক্ততার ফলে, কিন্তু চোর সে হইতেই পারে না।··· পিসিমা নিজেকে বড় চক্ষুষ্মান্‌ মনে করিতেছেন। ছিঃ!

বলিল,—তারপর?

—তারপর গল্প। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগ্‌লাম—সে নির্ব্বিকারে উত্তর দিতে লাগ্‌ল; কোন্‌টা অশিষ্ট, কোন্‌টা অনাবশ্যক, কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা লজ্জাকর সে বিষয়ে তার কোন চেতনাই দেখা গেল না।

—কি বুঝ্‌লে তাতে?

—এমন সমাজে সে মিশেছে যেখানে কথার শিষ্ট শোভনতা সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করা হয় না।

—তা তিনি মিশেছেন সত্যিই ; চিরকাল ছোটলোককে আস্কারা দিয়ে বেড়িয়েছেন ; কথার অপরাধ নে'য়াটা অভ্যাসের বাইরে চলে' গেছে।

—কিম্বা মনের ওপর দখল খুব।···তার গান শুনেছ ?

—শুনেছি। মধুর।

—চোখ দু'টি বড় বিষণ্ণ। অজয়া যে তাকে ভালবেসেছে তাতে আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইনি'।

—কেন ?

—অজয়া তখন দশ বছরের। তার পড়বার বইয়ে একটা গল্প ছিল যে, এক পর্য্যটক হঠাৎ একদিন দেখ্‌লে, একপাল নেকড়ে তার তাঁবুর চারিদিকে জিব বা'র করে' ঘুরছে। অন্য উপায় না দেখে তাঁবুর চারিদিক্‌কার ঘন জঙ্গলে সে আগুন লাগিয়ে দিলে ; নেকড়ের দল সেই বেড়া আগুনে একটি একটি করে' পুড়ে মল'।···অজয়া তাই পড়ে' কেঁদে আকুল।...আমি ছিলাম কাছে বসে'—ভাব্‌লাম, বুঝি সেই ভদ্রলোকের কষ্ট দেখেই সে কাঁদছে ; শুনে দেখি, আদৌ তা নয়।···বেচারা নেকড়েগুলো যে পুড়ে' মল' কাঁদছে সে তারই দুঃখে।···নেকড়ের হ'য়ে অজয়া চির-কাল লড়্‌বে যদি তারা অনাহারে শীর্ণ হয়।—একটু হাসিয়া পিসিমা আবার বলিলেন,—অজয়ার মুখে সিদ্ধার্থর কথা ধরে না ; কিন্তু সিদ্ধার্থ আমার সাম্‌নে অজয়ার নামটিও একবার উচ্চারণ করেনি।

—সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।···তিনি কেবল মায়ের নামে কেঁদে ফেলেন, দেশের নামে জ্বলে ওঠেন।···শুনে এলাম, উৎসাহের বাড়াবাড়ি নিয়ে তাঁকে কেউ বিদ্রূপ করলে তিনি, বলতেন, অতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে যাত্রা করাই শ্রেয়ঃ; কারণ পথে তার এত ক্ষয় আছে যে, তা' নইলে ঠিকানায় পৌছাবার আগেই বুক খালি হ'য়ে যায়।

—সকলের চেয়ে ভারি কথাটা এখনো বাকি আছে, রজত। সিদ্ধার্থ বিয়ে করবে না।

—করবে না? বলিয়া রজত যেন কাঁপিয়া উঠিল।

সিদ্ধার্থর প্রতি তাহার মনে মনে যে অভক্তির ভাবটা ছিল, লাহোর এবং হেমন্তপুর ঘুরিয়া আসার পরও তাহা সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই এই হিসাবে যে, সিদ্ধার্থ সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে হইলেও সে দরিদ্র—

ধনী গৃহস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ বরণীয় বটে··· কুলমর্য্যাদা তার প্রাপ্য—

কিন্তু যে ধন ত্যাগ করিয়া আসে নাই—

কেবল অতীত গৌরবের একটা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করিতেছে—বর্ত্তমানে তুলনাগত লৌকিক দাবি তার কতটা!··· নাই বলিলেও বোধ হয় চলে।

অথচ, সিদ্ধার্থ বিবাহ করিবে না শুনিয়া রজত নিষ্কৃতির আনন্দ পাইল না—

সিদ্ধার্থ নিজেই কর্ত্তা সাজিয়া তাহাদের উপর স্বেচ্ছাচারীর

মত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া যাইবে ইহাও অসহ্য।···সিদ্ধার্থ বিবাহ করিবে না শুনিয়া তাহার মনে হইল, সগোষ্ঠী তাহাদের একটা শোচনীয় পরাজয় ঘটিতেছে।

পিসিমা বলিলেন,—কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, বে-থা করে' সংসারী হবার কথা কখনো সে ভেবেছে কি না। শুনে সে হেসে বল্‌লে,—ভিক্ষুক দেশে যথেষ্ট আছে—তাদের সংখ্যা বাড়াবার আগ্রহ আমার নেই।...তারপর বল্‌লে, আমার মা নেই, মাতৃজ্ঞানে আপনার সম্মুখে বল্‌ছি, পরকাল আমি মানিনে; কিন্তু মানি যে ইহকালের সুখ নিশ্চেষ্ট ত্যাগে নয়, নিরঙ্কুশ ভোগে নয়, নিরলস কাজে।

রজতের রাগ হইল; বলিল,—জ্যাঠা ছেলে!...অজয়া শুনেছে?

—না;

—তুমি কেন বল্‌লে না, এমন বিয়েও ত' মানুষে করে যাতে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ে না!

পিসিমা তাহা বলিয়াছিলেন—

উপরন্তু ইহাও বলিয়াছিলেন যে, বিবাহ করিয়া উপার্জ্জনে মন দিলেও ত' চলিতে পারে।—

সিদ্ধার্থের গৃহ নাই—সেই দুঃখে সে একদিন রজত ও অজয়ার সম্মুখে অশ্রুমোচন করিয়াছিল—

কিন্তু পিসিমার কাছে সে বলিয়া গিয়াছিল, সে যে-ব্রত গ্রহণ

করিয়াছে, বন্ধন মানিলেই তাহার চ্যুতি ঘটে; বন্ধন-নির্ম্মুক্ত অখণ্ড প্রাণই দেশের জন্য আবশ্যক।—

দেশের এই প্রয়োজনটির উল্লেখে রজতের মুখ বিদ্বেষে বিকৃত হইয়া উঠিল; বলিল,—দেশের গয়ায় পিণ্ডি দিতে।...আবার উভয়সঙ্কট উপস্থিত।...সিদ্ধার্থবাবু এখন মুখ বুজে' চলে' গেলে অজয়া ভেঙে' পড়্‌বে; আমাদের পক্ষ থেকে নির্লজ্জের মত কথাটা তুললে তিনি ভাব্‌বেন, গছিয়ে দিচ্ছি।

—কি দেখে'? ও-রকম ভাব্‌নার দিক্ দিয়ে সে যাবে না। বলিয়া পিসিমা মনে মনেই একটু হাসিলেন।

রজত জানে না—

কিন্তু পিসিমা জানেন, পুরুষের পক্ষে এই লোভটা কত উগ্র। ...তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, মানুষের ভিতরকার সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সান্দ্র ছায়াটি—

ছায়াপাত হয়—

ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসে—

তারপর সুরু হয়, আলো-ছায়ার খেলা—

মুহুর্ম্মুহুঃ পটপরিবর্ত্তন—

তারপরই সেই যবনিকাখানি নামিয়া আসে যাহা নিষ্কম্প আর আলোকে উজ্জ্বল।

রজত ছাড়া আর যে-কেহ ইহা দেখিতে পাইত, কিন্তু মহা একটা উৎপাতের বিরক্তিতে বিভ্রান্ত হইয়া নিজেরই দায়িত্ব ছাড়া আর কিছুই তাহার চোখে পড়িল না।...সে দেখিল, সিদ্ধার্থ যাহা

বলিয়া গেছে কেবল তাই। বলিল,—আমি নিজের হাতে এই সঙ্কট গড়ে' তুলেছি।...সিদ্ধার্থ বাবুর প্রতি অজয়ার ব্যথার ব্যথীর ভাবটা যদি বাড়্তে না দিতাম! বলিয়া, কোন্ পর্য্যন্ত আসিলেই সে সিদ্ধার্থকে তাড়াইতে পারিত তাহাই গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।—

অজয়া চা লইয়া আসিল—

এবং তাহার দিকে চাহিয়া রজতের এমন একটা মমতা জন্মিল যাহা নিতান্তই অভিনব এবং যাহা অকস্মাৎ উদ্গত একটা প্রস্রবণের মত...চতুর্দ্দিকের ধূ-ধূ কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে তার কোনো সংস্পর্শই নাই।

...যেন বাতাসের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে—

মনের কোথাও দুশ্চিন্তার ম্লান রেখাটি পর্য্যন্ত নাই—

সে কি নির্ম্মম কাজই হইবে, যদি বিভোর সুখের এই লালিমা আঘাত পাইয়া বিবর্ণ হইয়া ওঠে...

সঙ্গে সঙ্গে রজত সিদ্ধার্থকেও ক্ষমা করিল—

হোক্ তার মূর্চ্ছা ভাণ, থাক্ তার চোখে চোরের দৃষ্টি—

অজয়ার দিকে চাহিয়াই, সিদ্ধার্থর বিরুদ্ধে সমুদয় অ-ক্ষমা অনিচ্ছার বাষ্প কাটিয়া তার মনের আকাশ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।—

অজয়া বলিল,—দাদা, চা।

রজত বলিল,—দিদি, গান। ননী কোথায়?

—তার অসুখ করেছে।—(পিসিমার প্রতি)—পিসিমা, এবারকার মন্ত্রণাসভা কাকে ডিস্‌মিস্ করল? তোমাদের আমি দোষ দিইনে।...ধারণার যা বাইরে ছিল. তাকে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লে তাকে অসঙ্গত অস্বাভাবিক অদ্ভুত বলে' কষ্টিপাথরের ওপর উদ্যত করা মানুষের স্বধর্ম্ম...মানুষ তাকে সন্দেহ করে' বর্জ্জন করতেই চায়।

রজত বলিল,—মানুষ জাতটার ওপরেই খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠেছ দেখ্‌ছি।...রত্ন কুড়িয়ে পেলেই তাকে মহার্ঘ্য জ্ঞানে ঘরে তুলতে হবে এমনধারা বাঁধা নিয়ম নেই, রত্নের মধ্যে ঝুটা আছে বলেই।...তা' যাই হোক্, ডিস্‌মিস্ আমরা কাউকে করিনি—সবাই স্ব স্ব স্থানে বজায় আছে, এবং যাতে আরো থাকে তারি আয়োজন চল্‌ছে। তোমার বর্ত্তমান স্থান—

বলিয়া হার্ম্মোনিয়ামটা দেখাইয়া দিল।

—যাই।...কিন্তু তোমরা আমায় ভুল বুঝলে কেন? তোমরা ভেবেছিলে, আমি তোমাদের বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াব—

—ঘুণাক্ষরেও তা' ভাবিনি'।

—ভেবেছ। তা' নইলে আমায় গোপন করে' দেশ দেশান্তর ঘুরে' এলে কেন? আর দিবারাত্র এই গোপন আলোচনাই বা কিসের?...তোমরা সিদ্ধার্থবাবুকেও চেননি', আমাকেও চেননি'। তিনি ভদ্রলোক—তিনি তা' নন্ জানা গেলে আমি অক্লেশেই তাঁকে ত্যাগ করবো। অতএব পরামর্শ-মজ্‌লিসে আমাকেও ডেক'।...দাদার চা কি মাটি হ'ল?

—না হ'য়ে আর করে কি! যে-রকম তলোয়ার ঘুরিয়ে এসে দাঁড়ালে তুমি—পিসিমা ত' একেবারে থম্‌কে' গেছেন; আমি ভাব্‌ছিলাম, এ-যাত্রা যদি বেঁচে যাই তবে চায়ের নামটি আর মুখে আন্‌ব' না।

…অজয়া হাসিমুখে যন্ত্রটার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

(১৬)

অজয়ার পালিত সন্তানদের উপনিবেশে আজ উৎসব—কর্ত্রী তাহাদের দেখিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সিদ্ধার্থ। ছেলে-মেয়েগুলি মিলিত-কণ্ঠে একটি গান গাহিয়া শুনাইল—লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যরাজ্যে কমলচরণ অর্পণ করিয়াছেন···তাঁহার চক্ষে জগদ্ধাত্রীর করুণা, হস্তে অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র...অন্ন বণ্টন করিয়া জননীর ক্লান্তি নাই...জননীর কৃপাশীর্ব্বাদে পৃথিবীতে অক্ষয় হেমন্ত ধান্যশীর্ষে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে...তাঁহাকে প্রণাম।—

গান শেষ করিয়া সকলে উভয়ের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল।

সিদ্ধার্থ বলিল,—গান তোমাদের কে শিখিয়েছেন ?

একজন বলিল,—গুরু-মা।

—গুরু-মা তোমাদের খুব ভালবাসেন ?

—খুব।

একটি বালিকা হঠাৎ সিদ্ধার্থকে দেখাইয়া অজয়াকে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—ইনি আমাদের কে, মা ?

শুনিয়া সিদ্ধার্থ মুখ টিপিয়া হাসিল—

কিন্তু অজয়া লজ্জা পাইল; বলিল,—ইনিও তোমাদের

অভিভাবক; তোমাদের ভালবাসেন, তোমাদের যাতে ভাল হয় তাই ইনি চান্; তোমরাও এঁর কুশল প্রার্থনা ক'রবে।

—তোমার বর?

বালিকার মুখনিঃসৃত প্রশ্নটি এতগুলি লোকের সম্মুখে উচ্চারিত হইল বলিয়াই যেন প্রাঞ্জল সত্যের মত শুনাইল—

এবং তাহার কৌতুকের দিক্‌টা হঠাৎ চোখে পড়িয়া সিদ্ধার্থ আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া হাসিয়া উঠিল।—

অজয়া বালিকার গাল টিপিয়া দিল; বলিল,—যাও, আজ তোমাদের দিনভোর ছুটি।—

সিদ্ধার্থও যেন সেই সঙ্গে ছুটি পাইয়া গেল—

তাহার মনে হইল, আর ভয় নাই; মনে মনের প্রায়শ্চিত্তেই তার পাপ সমূলে ক্ষয় হইয়া গেছে…ছোটরা ভবিষ্যতের ছায়া দেখিতে পায়; সহজজ্ঞানেই ভালমন্দ টের পায়।—

বালিকার প্রশ্নে অজয়ার মুখে বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা যায় নাই—যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারের সম্পর্কেই কেহ অপ্রাসঙ্গিক নহে, প্রাসঙ্গিকই কিন্তু অতিরিক্ত একটা উক্তি করিয়াছে।—

সিদ্ধার্থ মনে মনে ডানা মেলিয়া যেন বসন্তের পুষ্পশাখে যাইয়া বসিল।—

অজয়া সিদ্ধার্থর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—একেবারে মগ্ন হ'য়ে কি চিন্তা হ'চ্ছে?

সিদ্ধার্থ বলিল,—ভাব্‌ছি, প্রবাদ আছে, ভগবান মন বুঝে' ধন দেন—কথাটা সর্ব্বদাই ঠিক্ কি মাঝে মাঝে বেঠিক্ হ'য়েও থাকে।

অজয়া টেরও পাইল না যে, সিদ্ধার্থ নিজের কথাই বলিতেছে—

বালিকার মুখখানি সিদ্ধার্থ মনে মনে পুষ্প-চন্দনে অর্চ্চিত করিয়াছিল ; তারপর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভগবানের দানে মন-বিচারের কথাটা তার মনে পড়িয়া গেছে।

অজয়া বলিল,—দানেই যদি ধনের স্বার্থকতা ধরে' নে'য়া যায় তবে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেঠিক্।...কথাটা জন্মগ্রহণ করেছে সেকালের অভিজ্ঞতা থেকে। তখন ধনী মনে কর্‌তো সে কেবল হিসাবনবিশ্‌ তহবিলদার—চাহিদা মত দিয়ে দেবার ভার তার ওপর ; কাজে লাগ্‌বে তার যা দরকার। এখন সব উল্টে গেছে।

—কারণ কি অনুমান করেন ?

—আত্মপর বোধটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হ'য়ে উঠেছে। যে নিতে চায় তাকে নিতান্তই আপনার জন না ভাব্‌তে পারলে দে'য়া পাওয়ার আনন্দ কোনো তরফেই পূর্ণ হয় না—ভেতরে ফাঁক থেকে যায়।...আপনার জন এখন কেউ কারো নয় ; সঙ্কীর্ণতার সঙ্কোচের ফলেই এখন যথার্থ দাতা প্রার্থী দুই-ই কম।

কিন্তু সিদ্ধার্থর কানে অজয়ার কথাগুলি গেল কি না সন্দেহ—সে পরবর্ত্তী কথাটাই প্রাণপণে ভাবিতেছিল—

অজয়ার গলার আওয়াজটা থামিতেই সে যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল,—আমার দান বৃথা হয়নি'।...এই দেহ তার সঙ্গে

সামান্য জ্ঞান উর্ব্বর ভূমিকেই দান করেছি ; ফসল যখন ফল্‌বে, তখন সেই সীমান্তবিস্তৃত হরিৎ-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখব' দানের উদার সার্থকতা। দানে গর্ব্ব নেই—গর্ব্ব তার ফলে। —বলিতে বলিতে সহসা সে অজয়ার দিকে ফিরিল...অজয়া তাহার চোখের দিকে চাহিল না ; চাহিলে সে বিস্মিত হইত... দেখিতে পাইত, সিদ্ধার্থের দৃষ্টি যেন সেই মুহূর্ত্তেই মরিয়া হইয়া সাগর-গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে—সে-দৃষ্টি যুগপৎ এমনি শঙ্কিত এবং স্থির।—

সিদ্ধার্থর গায়ে তখন একবার কাঁটা দিয়া গেছে—

একটি কথা তার জিহ্বাগ্রে কাঁপিতেছে—আকর্ষিত জ্যা-লগ্ন তীরের মত লক্ষ্যে পৌঁছিবার তার স্পন্দহীন অব্যক্ত অধীরতা...

সিদ্ধার্থর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল—

বলিল,—আপনি দান করেছেন আপনার করুণায় ছল ছল বিপুল স্নেহ...তার ফল দেখে' গর্ব্বে ভরে' উঠ্‌ছে আমার বুক। কেন?—বলিয়াই সিদ্ধার্থ শুনিতে পাইল, গুরুগুরু শব্দে কোথায় যেন মেঘ ডাকিতেছে—

কিন্তু সেটা তারই বুকের শব্দ।...

অজয়া ধীরে ধীরে বলিল,—তা' ত' জানিনে।

—সহানুভূতি।...দু'টি প্রাণ করুণায় বিগলিত হ'য়ে ঢেলে পড়ছে একই পাত্রে। তারা একত্র হ'লে স্রোতের বেগ দুর্জ্জয় হবে। অজয়া—

বলিয়াই সে অজয়ার হাত ধরিয়া ফেলিল—

এবং তারপর কথা বলিবার পূর্ব্বে যে একটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল তাহারই মধ্যে জীবনের অনন্ত সুখ তার অনুভূতির প্রত্যেকটি পরমাণুর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল।···অজয়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া, হস্তবন্ধনের স্পর্শটুকু উপলব্ধি করিতে করিতে সিদ্ধার্থ গদগদস্বরে বলিল,—আমার জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা তোমাতেই মূর্ত্তিগ্রহণ করে' আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে···বলো, এসেই সে ফিরে যাবে না ?

—না।

—চলো যাই।

—চলুন।

(১৭)

সিদ্ধার্থ ভালবাসিয়াছে—

কিন্তু তার যন্ত্রণার অবধি নাই।

আগে অজয়ার সম্মুখে আসিলে তার অস্বস্তি লাগিত, এখন সেটা নাই—

এখন সে বেশ থাকে যতক্ষণ অজয়ার কাছাকাছি থাকে—একটা আশ্রয় পায়; অজয়ার রূপ নয়—তার সুদৃঢ় অন্তরের প্রভাবেই সিদ্ধার্থ নিজের ভিতর ফুটিতে পাইয়া বাঁচিয়া যায়—

কিন্তু ছাড়াছাড়ি হইলেই এখন তার মনে হয়, যেন অতিশয় গুরুভার একটা দৈবনির্য্যাতন গুটি গুটি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—তারই জ্বালা বহুদূর হইতে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত কুশাঙ্কুরের মত আসিয়া তার অস্থি মজ্জায় ফুটিতেছে।...একটা কালো পর্দ্দা বাদুড়ের দু'টো পাখার মত পৃথিবীকে দু'ভাগ করিয়া উঠিয়া আসে—

মধ্যস্থলে দু'টি নিষ্পলক চক্ষু—

পর্দ্দার ও-দিকে কুঞ্জে কুঞ্জে আলোর মধু-উৎসব—এ-দিকে অনন্ত অন্ধকার।

রূপলালসার সঙ্গে প্রয়োজন, তারপর জয়াকাঙ্ক্ষা যতদিন মিশিয়া ছিল ততদিন তার মনের বেগ দুর্দ্দমনীয় ছিল; কিন্তু জিতরাজ্যে জয়পতাকা উড়াইয়া আসিয়াই সে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

সেই দৃশ্যটা সিদ্ধার্থর অনুক্ষণ মনে পড়ে—

অজয়াকে পাশে লইয়া সে রজতের সম্মুখীন হইতেই রজত অজয়ার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল—

পিসিমা উভয়ের অক্ষয় সুখের কামনা করিয়াছিলেন—

অজয়ার মুখের উপর সুন্দর আলো আসিয়া পড়িয়াছিল··· কিন্তু সে-ছবিটা সিদ্ধার্থর সহ্য হয় নাই—

সরিয়া যাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আর্শিতে সে মুখ দেখে—

মুখের সে উজ্জ্বলতা নাই, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে।

এখনও সে আর্শিতে নিজের মুখখানা দেখিতেছিল—

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আর্শি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল···তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘুলাইয়া উঠিল ···পৃথিবীর কোথায় কোন্ প্রান্তে কি দৃশ্য অভিনীত হইতেছে তার কিছুই যেন তার ঠাহর হইতেছে না—

সে পলাইবে··· ··

এই ধাঁধাঁ আর দোলার পাকের ভিতর হইতে সে পলাইয়া

বাঁচিবে।…ধূমকেতুর যেমন উদয়ের তেমনি অস্তে যাওয়ার খেয়াল ‥দু'দিনের জন্য উঠিয়া মানুষের মনে অশেষ অকল্যাণের আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিয়া দূষিত বাষ্প ছড়াইয়া দিয়া আবার অন্ত আকাশে দেখা দেয়।—সে পলাইলে কাহারও ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সে হাঁফ লইয়া বাঁচিবে।…কেবল একখানি বুক ক্রন্দনবেগে দুই চারিবার দুলিয়া উঠিবে, দু'চার ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িবে, দু'চারিটি রাত্রি অনিদ্রায় কাটিবে—

কিন্তু যে দূষিত বাষ্প সে ছড়াইয়া দিয়াছে তাহার বিষে সে যদি শুকাইয়া ওঠে!…অমন সোনার রং নীল হইয়া যাইবে, অমন দৃঢ় অটল মন সহসা স্থানচ্যুত হইয়া এলাইয়া পড়িবে, অমন দৃষ্টি অন্ধকারে পথ পাইবে না।.....

এ ত' গেল ভাবের কথা—

অভাবের কথাটিও ভাবা চাই—

টাকা নাই, কিন্তু দেনা আছে, আর ক্ষুধা আছে।…এই যুগলমূর্তি প্রভুভক্ত কুকুরের মত এক মুহূর্ত তার সঙ্গ ছাড়িবে না—

তাদের অশ্রান্ত চীৎকার তাকে কেবলই নরকের দিকে ঠেলিতে থাকিবে।…

কাজেই পলায়ন স্থগিত রাখিয়া সিদ্ধার্থ মাথা ঠাণ্ডা করিতে বসিল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে সিদ্ধার্থ কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—

স্বপ্ন দেখিয়া ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া সে ঘর্ম্মাক্ত দেহে উঠিয়া বসিল।

লণ্ঠনের কাঁচটা কেরোসিনের কালিতে ভরিয়া উঠিয়াছে; তাহার ভিতর দিয়া আলোর শিখাটা অস্বাভাবিক লাল দেখাইতেছে···

সিদ্ধার্থ ত্রস্তনেত্রে চারিদিক্‌টা একবার চাহিয়া দেখিল—

স্বপ্নই বটে—

এবং তাহার বিবরণ এই :—

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে; চিতার আগুনে ধোঁয়া নাই, কিন্তু তার অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ নিবিড় আর নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া যেন তরল একটা স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে······

চিতায় শায়িত শবদেহটা দেখা যাইতেছে···

পুড়িতে পুড়িতে দেহটা কাষ্ঠশয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে মাটির উপর পা রাখিয়া নামিয়া দাঁড়াইল—আগুনের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল—

চক্ষু তার নির্নিমেষ—

আসিয়া সে সিদ্ধার্থেরই সম্মুখে দাঁড়াইল; বলিল,—চিন্‌তে পারছ?

—না, কে তুমি?

—আমি সিদ্ধার্থ। আমার প্রত্যাবর্ত্তন আশা করনি বুঝি?

—তুমি ত' মৃত।

—না, আমি জীবিত; বিবাহ করতে যাচ্ছি।··আমার পরিচয় চুরি করে' যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ, সে ত' আমার। তুমি তার কে?

এম্‌নি সময়ে অজয়া আসিল—

কপোলে তার প্রথম অভিসারের প্রগাঢ় লজ্জা—

হাতে তার সদ্যস্ফুট শুভ্র মল্লিকার একগাছি মালা।···অজয়া হাসিমুখে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছিল; শবদেহ হাত তুলিয়া নিষেধ করিল; বলিল,—তুমি ওকে ভালবাস না; তুমি ভালবাস আমার গল্পটিকে; জানো না, লোকটা জারজ, অর্থলোভে কুরূপা বৃদ্ধা বারাঙ্গনার সেবা ক'রত।···তুমি তার গলায় এসেছ মালা দিতে!···বলিয়া দেহ হাত বাড়াইয়া দিল—

অজয়ার শান্ত স্বপ্নালস চোখে হাসির দীপ্তি ঝলকিয়া উঠিল—

সে সেই হাতের হাড় জড়াইয়া ধরিল···

অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হইয়া সিদ্ধার্থ শবদেহকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেই পিছন হইতে কে মার্ মার্ করিয়া উঠিল,—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব তোর। চম্‌কিয়া পিছন ফিরিয়া সিদ্ধার্থ দেখিল, যার দোকানে সে বালকভৃত্য ছিল, সেই মুদি—

লাঠি তুলিয়া তাড়িয়া আসিতেছে······

পলায়নের উদ্দেশ্যে ছুটিবার উপক্রম করিতেই সিদ্ধার্থ মাটিতে পড়িয়া গড়াইয়া চলিল—ঘোরা শেষ হইলে লাটিম যেমন করিয়া গড়াইয়া ছোটে.·····

অজয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—

সেই হাসির শব্দ কানে লইয়া সিদ্ধার্থ ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে……

মৃতদেহের সেই পলকহীন চক্ষু—

সেই চক্ষু দু'টি সিদ্ধার্থর সম্মুখে অনির্ব্বাণ হইয়া জাগিয়া রহিল।

কিন্তু গলদ্ঘর্ম্মকর এত ক্লেশের মধ্যেও সিদ্ধার্থর তৃপ্তি এইটুকু যে, পরম দুঃখের ভিতরেও যে সুখের অমৃতবিন্দু লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহারই আস্বাদ তার মিলিয়াছে।…অজয়াকে ছিনাইয়া লইতে যে আসিয়াছিল, সে পরলোকের লোক—

তবু তাহাতেই বড় ব্যথা বাজিয়াছিল—

সেই অপার ব্যথার তাড়নে তার শরীরের স্নায়ুতন্ত্রী এখনো টন্‌টন্ করিতেছে—

কিন্তু সেই ব্যথার পশ্চাতেই যে আনন্দ হাসিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা নাই; সে-আনন্দ বিশল্যাকরণীর অমোঘ রসে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে…

স্বপ্ন মিথ্যা, কিন্তু আনন্দটি ত' পরম সত্য।

আজ সিদ্ধার্থ যেখানে সেখানে প্রাণের ফোয়ারা সহস্র ধারায় উৎসারিত…এই প্রাণের নির্ঝরে অবগাহন করিয়া সে বাঁচিবে, অমর হইবে।—রিক্তা প্রকৃতির বুকের উপর যে দিন আদি প্রাণমুকুলটি শুক্তিকোষে মুক্তাটির মত প্রথম সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেইদিন হইতে এই বাঁচিবার প্রয়াস-সংগ্রাম চলিয়া

আসিতেছে—একমাত্র রব—বাঁচো, বাঁচো।...অমোঘ আদেশ, অনন্ত তাগিদ্—ক্লীব-দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া পরিহার করিবার উপায় নাই।”—প্রেমে পশুত্ব যে দিয়াছে সে-ও ধন্য। প্রেমে স্বর্গীয় দেহাতীত পবিত্রতা কল্পনা করিয়া মানুষের এই অতিষ্ঠকর কলরব কতদিনের?—দেহ স্বল্পজীবী, আত্মা অমর—কিন্তু দেহ কি মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছারই বিগ্রহ নয়? শিবের পূজা শুদ্ধমাত্র তাঁর মাঙ্গল্যের পূজা নয়—সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষয় রাখিবার তাঁর যে শক্তি তাহারও পূজা।—

তারপর, হাতেখড়ির দিনটাকে সিদ্ধার্থের খুব শুভদিন মনে হইতে লাগিল—

সে দিনটা বিদ্যারম্ভের পক্ষে শুভদিন ছিল কি না, পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা কেহ দেখে নাই; কোনো দেবতাকে স্মরণ করা হয় নাই; পুরোহিতের পদধূলি অস্পৃশ্যের বিদ্যারম্ভ পবিত্র করেনি'—

এতগুলি ত্রুটি অনিয়ম সত্ত্বেও সেই কাজটি আজ সর্ব্বার্থ-সাধক সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। মা সরস্বতীর হাস্যচ্ছটা, নিকষের উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণরেখাটির মত, কঠিন অজ্ঞানান্ধকারের কোন্ স্থানটি প্রথম আলোকিত করিয়াছিল তাহার উদ্দেশ নাই; কিন্তু তাহারই বিস্তৃতিতে আজ ত্রিলোক উদ্ভাসিত।

...আশা জন্ম নিল—

তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল—

সিদ্ধার্থ দেখিতে দেখিতে চলিল, সে এক আশ্চর্য্য মায়াপুরী...

সেখানে কর্কশ শব্দ নাই, দুর্নীতির গণিকা বৃত্তি নাই, অভাবের প্রেত-নৃত্য নাই—

সে যেন মেঘরাজ্যের অপর পারের দুষ্প্রবেশ্য কল্পলোক—তাহার মূর্তি দেখিয়া আসিয়া সিদ্ধার্থের প্রলুব্ধ মন নিত্যকার জীবনের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া দিল—

বন্দী অতি গোপনে শৃঙ্খল কাটিতে লাগিল।...

তারপর সে সুকৌশলে পথ কাটিয়া কাটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শৈলশৃঙ্গে—

সেখানে একটিমাত্র গোলাপ ফুটিয়া আছে...

গোলাপের দলে দলে অফুরন্ত সৌরভ, সদ্যোত্থিত সূর্য্যের মত তার রঙ্; তার মুখের উপর কখনো মেঘের ছায়া, কখনো আকাশের আলো—

কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্গ।

অপর দিকে অতল অন্ধকার, তার নীচে পাথর। পড়িলে অন্ধকারের উদরে দেহ চূর্ণ হইয়া মিলাইয়া যাইবে।

সিদ্ধার্থ শিহরিয়া চোখ বুজিল।

কিন্তু সে-রাত্রি তার পায়চারি করিয়াই কাটিল, চোখে ঘুম আসিল না।

(১৮)

অজয়া তাহার বাবার ও মায়ের তৈলচিত্রের সম্মুখে নতশির হইয়া বসিয়াছিল—

মনে মনে বলিতেছিল—হৃদয়-আসনস্থ দেবতা, আমার প্রণাম গ্রহণ করো; আমার স্বর্গত জনকজননীর আত্মা তোমাতে বিলীন হ'য়ে বিরাজ করছেন; তোমার কণ্ঠে তাঁদের স্বর চির-মুখর হ'য়ে ফুটে আছে; তাঁরা তোমার কণ্ঠে আমার কুশল প্রার্থনা করছেন··· তাঁদের আশীর্ব্বাদ সার্থক হোক্।

তারপর মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিল,—মা, তোমার গভীর স্নেহার্দ্র চক্ষু আমার পানে চেয়ে হাসছে; পিতার হস্তের কল্যাণ-স্পর্শ আমার মাথার উপর নেমে এসেছে; আশীর্ব্বাদ করো মা, যেন তাঁর বলিষ্ঠ উদার হৃদয়ের যোগ্যা হই; তোমার মত পুণ্যবতী হই। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা, যেন আপনার পুরুষকার, নিষ্ঠা এবং শক্তি আমাদের দু'জনাতে প্রতিষ্ঠালাভ করে; আপনার অসমাপ্ত কর্ম্ম যেন আমরা দু'জনায় সমাপ্ত করতে পারি; যেন জীবনে শান্তি লাভ করি, যেন আপনার নামটিকে কখনো লজ্জা না দিই।—বলিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া অজয়া প্রোজ্জ্বল স্মিত বদনে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলা বাহুল্য, এ বিবাহ হইবেই।

অজয়ার এই প্রার্থনা সেই সম্পর্কে।

নিজেরই প্রার্থনার সুরের রেস্ অজয়ার দ্বিধা চিন্তাহীন অন্তরে তৃপ্তির মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল···

ননী আসিয়া খবর দিল,—একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। তোমাদের চেনেন।

—বুড়ো মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস্ বুঝি? শীগ্‌গির ওপরে নিয়ে আয়। দাদাকে খবর দিস্।

কিন্তু দরজার সম্মুখেই ননীর সঙ্গে আগন্তুকের দেখা হইয়া গেল।—

—তোমারি নামটি কি অজয়া?···তা' হ'লে তুমি আমার দিদি। আমি সিদ্ধার্থর মাতামহ।

অজয়া সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিল।

অজয়ার মাথার উপর হাত রাখিয়া কাশীনাথ আশীর্ব্বাদ করিলেন,—সৌভাগ্যবতী হও, ধন্য পুরুষ তোমাদের বংশধর হোক্।···রজতবাবু কোথায়?

—বসুন, তিনি আসছেন।

—বসি।...কিন্তু এই যে বস্‌লাম, কবে যে উঠ্‌ব' তার কিছু ঠিক্ নেই।···কাগজে পড়্‌লাম, সিদ্ধার্থকে তুমি বেঁধেছ। ভাব্‌লাম, সিদ্ধার্থকে যে বেঁধেছে, সে কেমন মেয়ে একটিবার তা' দেখে' আসি। তাই এলাম···তোমাকে আর সিদ্ধার্থকে নিয়ে

যাব বলে'।...দিদিমা বুড়িকে একটা প্রণাম করে' আসবে না? বুড়িও সঙ্গে আস্‌বে বলে' কোমর বেঁধেছিল; সঙ্গে করে তোমাদের নিয়ে যাব শপথ করে' তাকে থামিয়ে রেখে' এসেছি।—

অজয়া নূতন একটা আবেগ অনুভব করিতেছিল—

অচেনা এক নিমেষেই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতেছে...

মানুষকে আপন করিবার সহজ বুভুক্ষা তৃপ্ত হইয়া সেই তৃপ্তির আনন্দ-হিল্লোল অজয়াকে যেন আকুল করিয়া তুলিল—

কতদিক্ হইতে আনন্দ আসিতেছে তাহার ঠিক্ নাই—

পৃথিবী পরম সুন্দর—

মানুষ পরম মিত্র!...

অভিমানের সুরে বলিল,—তাঁকেও কেন নিয়ে এলেন না, দাদামশাই! বেশ হ'ত।

—সে অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক কথা। ক্রমশঃ শুন্‌বে।

রজত তার সেই পুরাতন চোখের জলের নলটা হাতে করিয়াই আসিয়া দাঁড়াইল।

অজয়া বলিল,—দাদা, ইনি সিদ্ধার্থবাবুর মাতামহ।

...নমস্কারাদির পর রজত বলিল,—এসেছেন বেশ হয়েছে; একটা মাথা পাওয়া গেল—বন্দোবস্ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঠিক হ'য়ে যাবে।...আপনি কোথা' থেকে আস্‌ছেন?

—রাজনগর থেকে।

—সিদ্ধার্থ বাবু ত' আপনার কথা কখনো বলেননি'!

—কেন বল্‌বে ? আমরা যে তার বন্ধন !···আমাদের কথা ত' সে মুখে আন্‌বে না। কিন্তু এইবার—

বলিয়া কাশীনাথ অজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলেন।

রজত বলিল,—এবার তাঁর অনেক পরিবর্ত্তন দেখবেন।

—স্পর্শমণি ছুঁয়েছে যে, পরিবর্ত্তন ত' হবেই।

—আপনি কোথায় পেলেন এ-খবর ?

—খবরের কাগজে।...আমি তাকে নিয়ে যেতে' এসেছি··· শুধু তাকে কেন—ফাঁদ শিকার দু'টিকেই।...সিদ্ধার্থ আমাদের বড় আদরের পাত্র। আমাদের পুত্রসন্তান নেই ; দু'টি কন্যা—তার একটি স্বর্গে, একটি বিধবা। রক্তের ধারা পুরুষের মধ্যে কেবল সিদ্ধার্থর দেহে বইছে ; সেই ধারা বন্ধ হ'য়ে যাবে এই ভয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে আস্‌ছিল···এমন সময় এই খবরটি পেয়ে বড় আনন্দে ছুটে' এসেছি।···তোমাদের দু'টিকে দেখে আমার আসা সার্থক হয়েছে।—বলিয়া তিনি অজয়ার মাথার উপর পুনর্ব্বার হাত রাখিলেন।

অজয়া বলিল,—দাদা, উনি দিদিমাকে কেন সঙ্গে আনেননি জিজ্ঞাসা করো। দিদিমা এলে কেমন আমোদ হ'ত।···

যে যেখানে আছে সবাইকে সে আজ একান্ত নিকটে চাহিতেছে।—

কাশীনাথ বলিলেন,—তা' হ'ত।···সে কথা থাক্।·· তোমাদের কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে—মনে থাকতে

বলে' রাখি। ভেব' না যেন, বুড়ো গাছে না উঠতেই এক কাঁদির স্বপ্ন দেখ্ছে।

রজত বলিল,—বলুন। আপনি আমাদের গুরুজন।

—বেঁচে থাক, সুখী হও।...আমি জীবনে অনেক শোক পেয়েছি; ছেলে মেয়ে জামাতায় আমার পাঁচটি চিতায় উঠেছে। —বলিয়া একটু থামিয়া কাশীনাথ বলিতে লাগিলেন,—আমার কেউ ছিল না; তোমরা আমার পরমাত্মীয় হ'লে।...সিদ্ধার্থ আমার উত্তরাধিকারী।...আমার স্থাবর অস্থাবর যে সম্পত্তি আছে তার মুনাফায় একটি পরিবারের রাজার হালে চলে।... তোমাদের হাতে সম্পত্তি তুলে' দিয়ে বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে আমরা কাশীবাসী হ'তে চাই। বলো দিদি, সিদ্ধার্থকে সঙ্গে নিয়ে সম্পত্তি দখল করে' বস্‌বে?

অজয়া বলিল,—বস্‌ব', আপনাকে ছুটি দেব। কিন্তু সে-কথা এখনি কেন, দাদামশাই!

—বলিয়ে নিলাম, যদি পরে সময় না পাই। মনে হ'চ্ছে, এই কথা ক'টি কারো কানে বলে' যাবার জন্যেই বেঁচে' ছিলাম।

—বলেছেন ভালই করেছেন, কিন্তু আমায় আপনার ক্ষমা করতে হবে।—বলিয়া রজত অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাব ধারণ করিল।

কাশীনাথ কহিলেন,—অপরাধ?

—অপরাধ আমি করেছি। সিদ্ধার্থবাবু গৃহহীন নিঃসম্বল বলে' এ-বিবাহে আন্তরিক মত আমার ছিল না।

অজয়া বলিল,—আমাকে ত' তা' বলনি', দাদা!

—না বলেছিলেন, ভালই করেছিলেন, বৃথা একটা অশান্তির সৃষ্টি হ'ত।...এখন যদি মত হয়েছে তবে আয়োজন শেষ করে ফেল—আমার তর্ সইছে না।

বিমল রাস্তার দিক্‌কার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল—

সুরেনের আসিবার কথা আছে, তাহারই প্রতীক্ষায়।

সে সেখান হইতে বলিয়া উঠিল,—দিদি, সিদ্ধার্থবাবু আসছেন।

শুনিয়া কাশীনাথ আকুল হইয়া উঠিলেন...“কই, কই” করিতে করিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন, রজতও গেল।

কাশীনাথ রাস্তার দু'দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কই?

রজত বলিল,—ঐ যে তিনি আস্‌ছেন। আপনি চেনেন না তাঁকে? অমন কর্‌ছেন কেন?

কাশীনাথ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন—

মুখাবয়ব এমনই শুষ্ক যেন তাঁর আয়ুষ্কাল দুঃসহ ক্ষিপ্রগতিতে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে...তাঁর লোল চর্ম্মের উপর দিয়া নিদারুণ একটা কণ্টকতরঙ্গ বহিয়া গেল।

অজয়াও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কাশীনাথের কণ্ঠে হিক্কার মত দু'বার কঠিন দু'টি শব্দ হইয়া স্বর যখন বাহির হইল, তখন তাঁহার মন যেন বিকৃত—

হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—আমি পালাই।

পরক্ষণেই বলিলেন,—না, পালাব না।...বলিতে বলিতে যে-রকম তিনি করিতে লাগিলেন সে ছট্‌ফটানির বর্ণনা নাই।

অজয়া ও রজত অপার বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল—

কাশীনাথ বলিলেন,—সিদ্ধার্থকে তুমি খুব ভালবাস? বলো, লজ্জা কি! আমি যে তোমার দাদা-মশাই।

বৃদ্ধের যেন কিছুরই দিশা নাই।

অজয়া নিরুত্তরে মাথা নত করিয়া রহিল—

বৃদ্ধ হাত চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু সিদ্ধার্থর যে আর একদণ্ড পরমায়ু; সে যে বাঁচবে না!

অজয়া চম্‌কিয়া উঠিল,—সে কি? কি বল্‌ছেন আপনি?

হঠাৎ অজয়া বৃদ্ধকে পাগল ঠাওরাইয়া বসিল।

—অদৃষ্ট আমার, বল্‌তে হচ্ছে, কিন্তু মিথ্যে বল্‌ছিনে।... ভগবান্, দুষ্টের দমন কি তুমি এই ভাবে করছ! দিদি, আমার আরো কাছে এস—তোমার মুখখানি ভাল করে' দেখি।... বিধাতা, এত বড় আঘাতটা এই ফুলের বুকে নিক্ষেপ না কর্‌লে কি তোমার রাজত্ব অচল হ'য়ে যেত! বলিতে বলিতে কাশীনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এই সব উচ্ছ্বাসে রজতের খুব বিরক্ত বোধ হইতেছিল—সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অজয়া বলিল,—শান্ত হোন্।...আমরা কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনে।...কি হয়েছে বলুন।

—বলব বই কি; বলাতেই ত' ভগবান আমায় সময় উত্তীর্ণ না হ'তে দিয়ে টেনে এনে তোমাদের মধ্যে ফেলেছেন।

…সিদ্ধার্থর পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শোনা গেল—

কাশীনাথ এ[illegible]র আলুথালু হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—তোমরা থাকো—আমিই এগিয়ে যাই……

সিদ্ধার্থর চোখের জ্যোতিঃটা ফিরিতেছিল—

বৃদ্ধ কাশীনাথকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া সেইটাই আগে দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল—

তার পর ত্রাসে কি কিসে কে জানে তাহার মূর্ত্তি এমন বেপমান্ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, যেন সে রোগশয্যা ছাড়িয়া এইমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে……

কিন্তু দেখিতে দেখিতে ভিতরকার যে পশুটাকে এতদিন সে সযত্নে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল সেইটাই জাগিয়া উঠিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল।

এত কাণ্ড ঘটিতে মাত্র এক মুহূর্ত্ত সময় গেল…..

রজত বলিল,—সিদ্ধার্থবাবু চিন্‌তে পার্‌ছেন না ? ইনি আপনার মাতামহ।

বৃদ্ধ সিদ্ধার্থর মাতামহ নন্—

কিন্তু তাঁহাকে সে চিনিয়াছে—

এবং তন্মুহূর্ত্তেই সে বুঝিয়াছে যে, তাহার এখানকার লীলার উপর শেষ যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে—

সে মরিয়া হইয়া উঠিল ; বলিল,—চিনেছি।…চিঠিগুলি সব আমার কাছেই আছে—